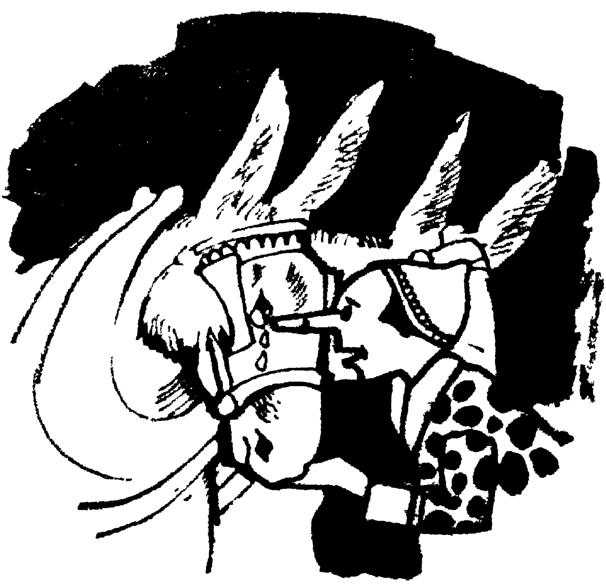
কাঠের মানুষ

আবুল হোসেন মীর





প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৬৪

প্রকাশক ঃ

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]

৭৭ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা-১

মুদ্রাকর ঃ

এ্যাবকো প্রেস

৬-৭ আওলাদ হোসেন লেন

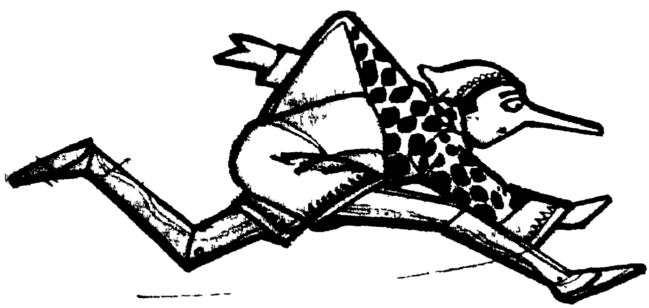
ঢাকা-১

KATHER MANUSH
by Abul Hossain Meer
Illustration by Hashem Khan
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca-1
Bangladesh

কাঠের মানুষ

আবুল হোসেন মীর

ছবি ঃ হাশেম খান



মুক্তধারা



সাকীল ও সোহেল,
তোমরা যখন বড় হবে
অনেক বড় হবে,
তখন আমি নাইবা থাকি
'কাঠের মানুষ' রবে।

---আব্বা





আমার কথা

এক টুকরো কাঠ। সেই কাঠ থেকে তৈরি করা হোল এমন একটি পুতুল—যে নাচতে জানে, গাইতে জানে, লাফাতেও জানে। চরম উচ্ছৃঙ্খল এই পুতুলটি অবশেষে একটি সত্যিকারের মানুষ হ'তে পারলে মানুষের সন্তান কেনো মানুষ হ'তে পারবে না ?

বন্ধুবর ফাদার রিগনের মুখে ইতালীয় এই কাহিনীটি ভাংগা-ভাংগা বাংলায় শোনার পর থেকে লোভ সামলাতে পারিনি। সে-দিন ডায়রীর পাতায় সংক্ষিপ্ত নোট নিতে নিতে আমি নিজেই যেন কোনো রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই কথার টুকরো-গুলি চেঁচে ছোলে, জুড়ে-গেঁথে আমি যে এই 'কাঠের মানুষ' তৈরি করতে পারবো একথা ভবতেও পারিনি।

সত্যি সত্যি মানুষ কি আর কাঠ দিয়ে হয় ? কাহিনীটি দৈনিক আজাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে মুকুলের মহফিলের ভাই বোন-দের মনে উদ্রিক্ত এই সন্দেহ দূর হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে চলেছে মুক্তধারা। নেপথ্যে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন সাহা। তাঁর উৎসাহ ও উদারতার প্রশস্ত মাঠে যাঁরা ছুটাছুটি করেছেন তাঁরা কখনোই ভুলতে পারবেন না তাঁকে। তাদের শ্রদ্ধার জয়-তিলক তাঁর ললাটে অক্ষয় হয়ে থাকবেই।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বন্ধুবর হাশেম খানের প্রশংসা চিত্রিত না করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার শ্রদ্ধেয় কবি হাবীবুর রহমান এবং কবি আবদুস সাত্তারসহ অন্যান্য যাঁরা বইটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আমাকে সর্বপ্রকারে উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাঁদের জন্যে আমার শ্রদ্ধার ডালা উন্মুক্ত রইলো।

মোটকথা, যাঁরা বইটি প্রকাশনায় যে কোনো দিক থেকেই আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। তাঁরা আমার আত্মার আত্মীয় হয়ে থাকুন।

লেখক





॥ এক ॥

কাঠমিস্ত্রি মাস্টার বুলেট এক টুকরো কাঠ পেলো।
কাঠখানা শিশুদের মতো হাসছিলো আর কাঁদছিলো!

একবার এক রাজা ছোট ছোট পাঠকদের উদ্দেশে বললেন ঃ

—না। আমার ছেলেরা, তোমরা ভুল করছো।

সেটা ছিলো ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো। তেমন দামী নয়—অতি সাধারণ কাঠ। যে কাঠ আমরা সচরাচর চুলোয় জ্বালাবার জন্যে ব্যবহার করে থাকি। শীতের সময় উনুন জ্বেলে ঘর গরম করি।

কেমন করে পেয়েছে জানি না। শুধু এইটুকু জানি, সেই কাঠখানা পড়েছিলো এক বুড়ো মিস্ত্রির হাতে। নাম তার মাস্টার বুলেট। কিন্তু সবাই ডাকতো ওস্তাদ করমচা বলে।

করমচা হোল ছোট্ট ছোট লাল লাল এক রকম ফল। এই ফলের নামে তাকে ঠাট্টা করেই ডাকা হোত। কারণ, তার নাকের অগ্রভাগটা ছিলো ঠিক একটা পাকা করমচার মতো লালচে।

কাঠখানা হাতে পেয়ে খুব খুশী হলো মাস্টার করমচা। আনন্দে দু'হাতের তালু ঘষতে লাগলে। মনে মনে বললে—'বেশ ঠিক সময়েই এসে পড়েছে কাঠখানা। এক্ষুণি একটা টেবিলের পায়া তৈরী করে ফেলছি।' বলার সাথে সাথে একটা কুড়াল দিয়ে কাঠটাকে চেঁচে ছিলে সঠিক মাপে পায়া তৈরী করবার কাজে লেগে গেলো সে।

কিন্তু এক মজার কাণ্ড ঘটে গেলো তখন। কুড়ালটাকে উপরে তুলে যেই কোপ মারতে যাবে অমনি তার হাত উপরের দিকেই উঠে রইলো। নড়লো না চড়লো না একটুও। কারণ কি জানো? একটা অদৃশ্য শব্দ পেয়ে থমকে গিয়েছিলো সে। অতি ক্ষীণ সে কণ্ঠ। কেউ তাকে অনুরোধ করে বলছে—'আমাকে জোরে মেরো না।' এখন তোমরা বুঝতেই পারছো সেই সরল বুড়ো ওস্তাদ করমচার অবাক হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

মহা মুশকিলে পড়ে গেলো ওস্তাদ করমচা। কার কণ্ঠ কোথা থেকে ভেসে এলো? ঘরের এখানে সেখানে লক্ষ্য করতে লাগলো। কাউকেই দেখা গেলো না কোথাও। টেবিলের নীচে, আলমারীর মধ্যে যেখানে কাঠের গুঁড়োগুলো পড়েছিলো সেখানে, কোথাও পাত্তা নেই। শেষে ঘরের দরজা খুলেই বাইরে রাস্তার দিকে তাকালো—সেখানেও কেউ নেই। তা হলে?

হাসি পেলো ওস্তাদ করমচার। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো—

—বুঝেছি! তাহলে আমারই ভুল হয়েছে।

বলে আবার কাজে হাত দিলো সে। শক্ত হাতে কুড়ালটাকে ধরে খুব জোরে মারলো এক কোপ।

—হায়-হায়-হায়! শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে মারলেই? সেই শব্দটা চিৎকার করে উঠলো।

এবারে ওস্তাদ করমচা ভয়ে একেবারে পাথর। চোখ দুটো যেন ছিটকে পড়তে চাইছে মাথার বাইরে। মুখ খোলা। জিভটা ঝুলে পড়েছে একদম। গোটা চেহারাটাই মুখোশের মতো অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। আবার যখন কথা বলতে পারলো তখন তোত্‌লা হয়ে গেছে সে। রীতিমতো কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে আর তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বললো—এই একটু আগেই হায় হায় করে উঠলো কে? আশ্চর্য! এখানে তো কোন জীবিত প্রাণী নেই। তবে কি ওই কাঠের টুকরোগুলো বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি

আর নালিশ করতে শিখেছে? তাই বা কি করে হয়! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না মোটেই।

সামান্য কাঠ। চুলোর কাঠের মতোই। আগুনে দিয়ে রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায় একে। তাহলে এর ভিতরে কি কেউ লুকানো রয়েছে? বেশতো, কেউ যদি থেকেই থাকে তবে সে মজা বুঝুক। আমি এক্ষুণি উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

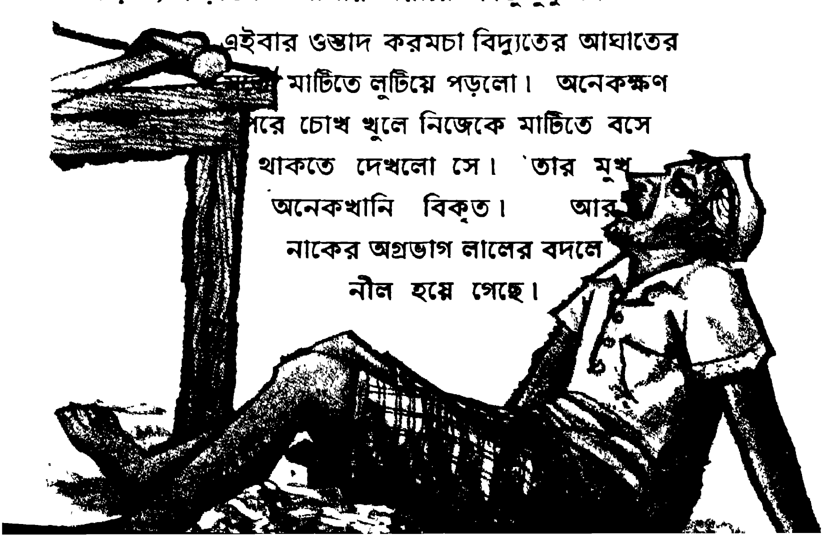
কথাগুলো বলার সংগে সংগেই দু'হাতে সেই কাঠটা ধরে নির্দয়ভাবে দেয়ালে, মেঝেয়, চারিদিকে আঘাত করতে আরম্ভ করলো। আর মাঝে মাঝে কান পেতে কিছু শুনবার অপেক্ষায় রইলো। যদি সেই কণ্ঠ আবার কথা বলে ওঠে! দু'মিনিট এমনি অপেক্ষায় কাটালো— কিছু না। পাঁচ মিনিট— কিছু না। দশ মিনিট- কিছুই না।

—বুঝেছি। বলে আবার হাসতে চেষ্টা করলো সে। আগের মতো চুল নাড়া চাড়া করতে করতে মনে মনে সেই সুর আওড়াতে লাগলো। এবারেও ভাবলো—হয়তো ভুল করছে সে। আবার কাজে মন দিলো। কিন্তু তার বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ আর যায় না। সাহস পাবার জন্যে গান গাইতে চেষ্টা করলো। কুড়াল ছেড়ে রাঁ-দা' হাতে নিলো। কাঠখানা চাঁচতে শুরু করে দিলো।

কাঠ চাঁচা হচ্ছে। উপরে আর নীচে বারে বারে ওঠা নামা করছে রাঁ-দা'টা। খোসার মতো কাঠের গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এদিক সেদিক। হঠাৎ করে সেই অদৃশ্য শব্দটা আবার বেজে উঠলো ওস্তাদ করমচার কানে।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার শরীরে কাতুকুতু দিও না।

এইবার ওস্তাদ করমচা বিদ্যুতের আঘাতের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে নিজেকে মাটিতে বসে থাকতে দেখলো সে। তার মুখ অনেকখানি বিকৃত। আর নাকের অগ্রভাগ লালের বদলে নীল হয়ে গেছে।



।। দুই ।।

মাস্টার বুলেট তার বন্ধু বাটুল মিয়াকে দান করে দিলো কাঠের টুকরোটা। সেই কাঠ দিয়ে এমন একটা চমৎকার পুতুল তৈরী করতে চাইলো সে—যে নাচতে জানবে, লাফাতে জানবে, আর খেলতে জানবে।

ঠিক সেই সময় দরজায় ধাক্কা পড়লো।

—ভিতরে এসো। সেই কাঠের মিস্ত্রি বললো। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার শক্তি হোল না তার।

একটা বেটে গোছের বুড়ো লোক তখন দোকান ঘরটায় ঢুকে পড়লো। বুড়ো হলে হবে কি—বেশ শক্তিশালী লোকটা। বাটুল মিয়া তার নাম। এদিকে আশপাশের দুষ্টু ছেলেরা কিন্তু তাকে রাগাবার জন্যে ডাকতো গোল আলু বলে। কারণ তার চুল ছিলো অনেকটা গোল আলুর রঙের মতো।

বাটুল মিয়া ছিলো ভয়ানক মেজাজী। তাকে গোলআলু বলতে হলে সাবধান থাকতে হোত। তখুনি কেউটে সাপের মতো ফোঁস করে উঠতো সে। কার সাধ্য তখন তাকে ঠাণ্ডা করবে!

—সুপ্রভাত মাস্টার বুলেট। বাটুল মিয়া বললো।

—মাটিতে বসে বসে কি করছেন?

—পিঁপড়েগুলোকে ক, খ, শিখাচ্ছি।

-বেশ ভালো। আপনার উপকার হোক।

—আচ্ছা বন্ধু বাটুল মিয়া, আপনাকে কে নিয়ে এলো এখানে? আপনি চিনলেন কি করে?

—আমার পা। মাস্টার বুলেট, আমি আপনার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে।

—বলুন। আমি আপনার সেবার জন্যে এক পায়ে খাঁড়া। কাঠের মিস্ত্রি উত্তর দিলো হাঁটু গেঁড়ে।

—দেখুন, আজ সকাল থেকেই আমার মাথায় একটা চিন্তাধারা বৃষ্টির মতো ঝরছে!

—কিসের চিন্তা?



-আমি ভাবছি একটা সুন্দর পুতুল তৈরী করবার কথা। সত্যি সত্যি সেটা হবে একটা চমৎকার পুতুল। সে নাচতে জানবে, লাঠি খেলতে পারবে, লাফালাফি করে বেড়াবে। এই পুতুল নিয়ে আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো। আর লোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করবো। নিজে ভালোভাবে রোজগার করে বেঁচে থাকবো। আপনি কি বলেন?

খুব ভালো গোল আলু। সেই অদৃশ্য শব্দটা মৃদুগলায় বলে উঠলো। কিন্তু কোথা থেকে কে বলে উঠলো তা বুঝতে পারলো না ওরা কেউ। বন্ধু বাটুল মিয়া যেই শুনেছে তাকে গোল আলু বলা হয়েছে আর যায় কোথায়! একটা পাকা মরিচের মতো লাল হয়ে উঠলো সে। কাঠের মিস্ত্রির দিকে তাকিয়ে হিংস্র হয়ে উঠলো।

-আমাকে এভাবে অপমান করার মানেটা কি?

-কে অপমান করেছে আপনাকে?

- আপনি আমাকে গোল আলু বললেন!

—না, আমি কিছুই বলিনি।

—চমৎকার! তবে আমি বলেছি নাকি? দেখুন আপনিই বলেছেন।

—না।

— হ্যাঁ।

—না।

— হ্যাঁ।



উভয়েই রাগে কট্‌মট্‌ করছিলো তখন। ক্রমে ক্রমে সেই রাগ ঝগড়ায় এবং ঝগড়া থেকে জড়াজড়িতে পরিণত হোল। একজন অপরজনকে খামচাতে লাগলো। কামড়ে দিলো। চুল টানাটুনি করলো। একরকম ছোটখাটো যুদ্ধই শুরু হয়ে গেলো সেখানে। একজন অপরজনের উপর চড়াও হয়ে উল্‌টাতে পাল্‌টাতে লাগলো।

যখন লড়াই শেষ। মাস্টার বুলেটের হাতে বাটুল মিয়ার হলদে টুপি রইলো। আর বাটুল মিয়া দেখলো তার মুখেও সেই কাঠমিস্ত্রির টুপিটা ঝুলছে।

—আমার টুপি ফিরিয়ে দাও। মাস্টার বুলেট চিৎকার করে উঠলো।

—তুমিও আমার টুপি ফিরিয়ে দাও। এসো মীমাংসা করি।

তারপর সেই টুপি অদল বদল হোল।

এই দুই বেটে বুড়ো আপন আপন টুপি ফিরে পাবার পর হাত ধরাধরি করে শপথ করলো—সারাটা জীবন তারা দুটি বন্ধু মিলে মিশে থাকবেই থাকবে।

—তাহলে বন্ধু বাটুল মিয়া! সেই কাঠের মিস্ত্রি বললো। আমার কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন?

—আমি এক টুকরো কাঠ চাই আমার পুতুল তৈরী করবার জন্যে। আমাকে দেবেন?

—নিশ্চয়ই দেবো।

মাস্টার বুলেট খুব খুশী হলেন। যে কাঠ এতোক্ষণ তার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেটাকে তুলে দিলেন বন্ধুর হাতে। কিন্তু যখনি দিতে গেলেন, কাঠখানা নড়েচড়ে উঠলো। তার হাত থেকে জোর করে সরে গেলো। আর গিয়ে সজোরে পড়লো বেচারা বাটুল মিয়ার পায়ের উপর।

—হায় হায়! মাস্টার বুলেট আপনি আমাকে বেশ ভালো ভাবেই দান করলেন। আমার পা খোঁড়া করে দিলেন।

—দিব্যি করে বলছি, আমি করিনি।

—তাহলে আমি করেছি?

—বিশ্বাস করুন সমস্ত দোষ এই কাঠের।

—আমি জানি এই কাঠের দোষ। কিন্তু আপনিই তো আমার পায়ে ফেলে দিলেন।

—আমি ফেলে দিই নি।

—মিথ্যাবাদী।

—আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন না বাটুল মিয়া। তাহলে আমি আপনাকে গোল আলু বলে ডাকবো।

— গাধা।

—গোল আলু।

—খচ্চর।

—গোল আলু।

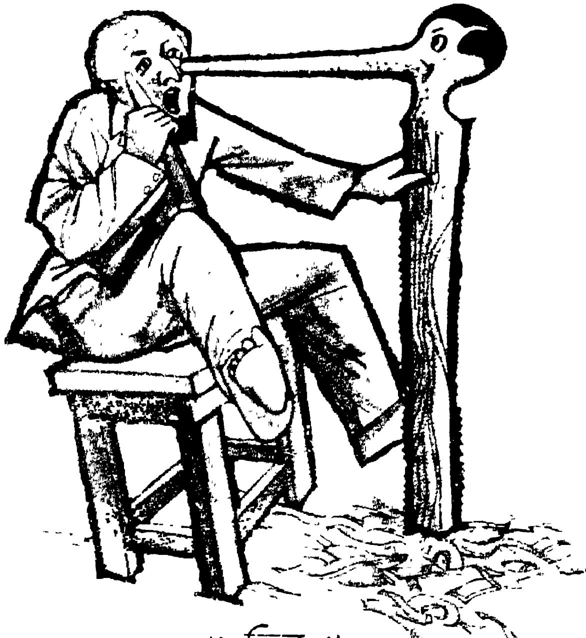
—বানর।

—গোল আলু।

বাটুল মিয়া তৃতীয়বার যখন গোল আলু কথাটা শুনলো তার চোখে আর আলো রইলো না। রেগেই টং। সংগে সংগে কাঠের মিস্ত্রিটাকে আক্রমণ করে বসলো। দুজনে তখন কি মারামারি! মারামারি থেমে গেলে মাস্টার বুলেটের নাকে দুটো লম্বা ক্ষত দেখা গেলো। আর বাটুল মিয়ার জামার দুটো বোতাম কম পাওয়া গেলো।

দুজনেই সমান—দু'য়ে দু'য়ে মিল। ঠিক ঠিক হিসাব। এভাবে উভয়ের অংকের ফলাফল সঠিক হলে দুজনেই আবার প্রতিজ্ঞা করে নিলো—এবার থেকে আর কোনোদিন গণ্ডগোল করবেনা তারা।

অবশেষে বাটুল মিয়া সেই অদ্ভুত কাঠখানা নিয়ে মাস্টার বুলেটকে ধন্যবাদ জানিয়ে খোঁড়া পায়ে টলতে টলতে বাড়ীর দিকে রওনা হোল।



।। তিন ।।

বাটুল মিয়া বাড়ী ফিরে এসে তক্ষুণি পুতুল তৈরী করতে লাগলো। পুতুল গড়া শেষ হলে তার নাম রাখা হোল ভণ্ডুল। তারপর পুতুলের দুষ্টুমি শুরু।

ছোটখাট ঘর বাটুল মিয়ার। আসবাবপত্র অতি সামান্য। নড়বড়ে একটা পুরানো চেয়ার। একটা ভাঙাচুরা টেবিল। দেয়ালের গায়ে একপাশে একটা চুলোর ছবি। আগুন জ্বলছে। একেবারে সত্যিকারের আগুন যেন। আবার আগুনের উপরে একটা বালতি আঁকা। বালতি থেকে ধুমা উড়ছিলো মেঘের মতো। যেন একেবারেই সত্যি সব। বাড়ীতে পেঁৗছেই বাটুল মিয়া যন্ত্রপাতি নিয়ে তার শখের পুতুলটিকে তৈরী করতে শুরু করে দিলো। আর মনে মনে ভাবতে লাগলো—কি নাম রাখা যায় তার।

অবশেষে নাম ঠিক করে ফেললো। বললো—হ্যাঁ, এর নাম রাখবো ভণ্ডুল। খুব সৌভাগ্যশালী নাম হবে এটা। আমার ভাগ্য ফিরিয়ে আনবে। আমার শুধু মনে হচ্ছে—ভণ্ডুল নামের পরিবারকে জানতাম আমি। বাবার নাম ভণ্ডুল। মা'র নাম ভণ্ডুলা। আর তাঁদের ছেলে-

মেয়েদের নামও ভণ্ডুল। সবাই তেমন মন্দ ছিলো না। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলো ভিক্ষুক।

পুতুলের নাম পেলো বাটুল মিয়া। এবারে নিজের কল্পনানুসারে সেই পুতুলের রূপ আঁকতে লেগে গেলো। তার চুল, কপাল, চোখ তৈরী করে ফেললো।

চোখ শেষ করতেই নড়েচড়ে উঠলো। আর বাটুল মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো স্থিরভাবে। তোমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারো কতোখানি আশ্চর্য হয়ে গেলো বাটুল মিয়া।

বাটুল মিয়া যখন দেখলো সেই কাঠের চোখ দুটো তার দিকে তাকিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে তখন সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো—কাঠের দুষ্টু চোখ, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে দেখছো কি?

জবাব এলো না কিছু।

চোখের পরে নাক গড়া হোল। কিন্তু সেই নাক সংগে সংগে লম্বা হতে শুরু করে দিলো। লম্বা হ'তে হ'তে কয়েক মিনিটের মধ্যে মস্তবড় হয়ে গেলো। বেচারা বাটুল মিয়া তখন সেই নাক কেটে কমাবার জন্যে খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু যতো কাটছিলো বেড়ে চললো ততোই।

নাকের পরে মুখ ধরা হোল। কিন্তু মজার ব্যাপার, মুখ শেষ না হতেই সেই মুখ হাসাহাসি ও নানারকম ঠাট্টা তামাসা শুরু করে দিলো। বাটুল মিয়া তখন অধীর হয়ে বললো—হাসাহাসি করো না।

কিন্তু কোনো ফল হোল না।

—হাসাহাসি বন্ধ করো, আবার বলছি। বলেই জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে। মুখটি তখন হাসাহাসি বন্ধ করলো বটে। কিন্তু গোটা জিভটাই বের করে দিলো।

এবারে বাটুল মিয়া গোলযোগ না বাঁধিয়ে বাকী কাজে মনোযোগ দিলো। মুখের পরে দাড়ি, গলা, পেট ও হাত যথারীতি তৈরী করে ফেললো। হাত শেষ করা মাত্রই যখন বাটুল মিয়া টের পেলো তার মাথা থেকে টুপি চলে গেছে, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে কি দেখলো? দেখলো, পুতুলের হাতে তার টুপি।

—ভণ্ডুল, এক্ষুণি আমার টুপি ফিরিয়ে দাও।

ভণ্ডুল টুপিটা ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের মাথায় পরিয়ে দিলো। টুপিটা ছিলো একটু বড়। গোটা মাথাটাই ঢেকে গেলো তার। তাই না দেখে ভণ্ডুলের দিকে তাকিয়ে বাটুল মিয়া বললো—

—দুষ্টু ছেলে কোথাকার! এখনো পুরোপুরি গড়ে তুলতে পারলাম না। আর তার আগেই তুমি তোমার বাবার অসম্মান করছো? বাচ্চা আমার, এসব ভালো না—ভালো না। বলে নিজের চোখ মুছলো সে। বাকী ছিলো উরু আর পা। বাটুল মিয়া যখন পা তৈরী শেষ করেছে এক লাথি এসে লাগলো তার নাকের ডগায়। মনে মনে বললো- বেশ হয়েছে। আগেই বিবেচনা করা উচিত ছিলো আমার। এখন দেরী হয়ে গেছে।



তারপর সেই পুতুল-টাকে ধরে মাটির উপর রাখলো। আর ধরে ধরে হাঁটা চলা শিখাতে লাগলো।

ভণ্ডুল হাঁটছিলো। কিন্তু পা চলছিলো না ভালো করে। চলবে কি করে? নাড়াচাড়া করতেই তো জানে না সে। বাটুল মিয়া ধরে ধরে একটার পর আরেকটা পা এগিয়ে দিয়ে তাকে হাঁটতে সহায়তা করছিলো। এমনি করে করে পা অনেকটা ঠিক হয়ে এলো। এবারে ভণ্ডুল নিজে নিজেই হাঁটতে শিখলো। ছুটাছুটি করতে লাগলো এখানে ওখানে। হঠাৎ দরজার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর পালাতে শুরু করে দিলো।

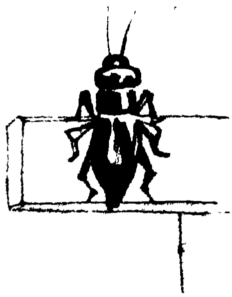
তখন বেচারা বাটুল মিয়া তার পিছনে পিছনে ছুট দিলো। কিন্তু ধরতে আর পারছিলো না। দুষ্টু ভণ্ডুল হরিণের মতো দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে এগুচ্ছিলো। তার কাঠের পা রাস্তার উপরে ভয়ানক ঠক্ ঠক্ করে চলছিলো। মনে হয়েছিলো কুড়িটি ঘোড়া বুঝি এক সাথে চলছে।

—ধর ধর। চিৎকার করছিলো বাটুল মিয়া।

কিন্তু ধরবে কে? রাস্তার লোকজন কাঠের পুতুলকে অমন ছুটাছুটি করতে দেখেই তো অবাক। বরং তারা হাসাহাসি করছিলো সবাই। ভাগ্য ভালো, একজন পুলিশ সেই রাস্তায় এসে পড়লো তখন। পুলিশটি



রাস্তার মধ্যে দু'পা ফাঁক করে তাকে ধরবার জন্যে রুখে দাঁড়ালো। ভণ্ডুল দূর থেকে রাস্তার উপরে পুলিশকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়েই অনায়াসে তার নাক ধরে বসলো (সেই একেবারে লম্বা নাক। পুলিশের ধরবার জন্যেই যেন তৈরী হয়েছিলো)। তারপর পুতুলকে নিজের হাত থেকে বাটুল মিয়ার হাতে দিলো।

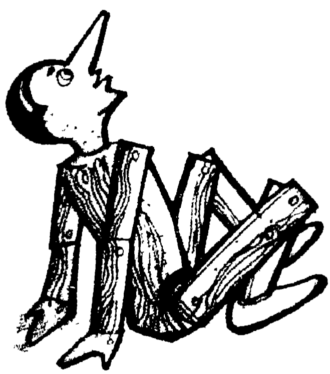


এদিকে বাটুল মিয়া তাকে শাসন করতে গিয়ে যেই কান ধরতে গিয়েছে, অমনি দেখে কান নেই। জানো কেনো? আসলে কিন্তু কান গড়তে ভুলেই গিয়েছিলো সে। কি আর করা যায়? শেষে পুতুলের পিছনটা ধরে ঘরে ফিরিয়ে নেবার পথে বাটুল মিয়া মাথা নেড়ে ধমক দিতে দিতে বললো—

—ঘরে ফিরে চলো আগে। তারপর ওখানে গিয়েই হিসাব নিকাশ হবে।

কথা শুনে ভণ্ডুল একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর চলতে চাইলো না। ইতিমধ্যে অনেক লোকজনের ভিড় জমে গিয়েছে সেখানে। সমবেত সবাই নানা ধরনের কথা বলে চলছিলো। কেউ কেউ বললো—

—বেচারা পুতুল। সে ঘরে যেতে চায় না। ঠিক করছে। কি জানি ওই নিষ্ঠুর লোকটা ওকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে মারধর করে।



কেউ কেউ চালাকি করে বলে—

—বাটুল মিয়া আবার ভালোলোকী দেখায়। অথচ ছেলেপিলেকে কষ্টও দেয়। যদি এই পুতুল বেচারাকে তার হাতে দেওয়া হয় তবে নিশ্চয়ই

ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে সে।

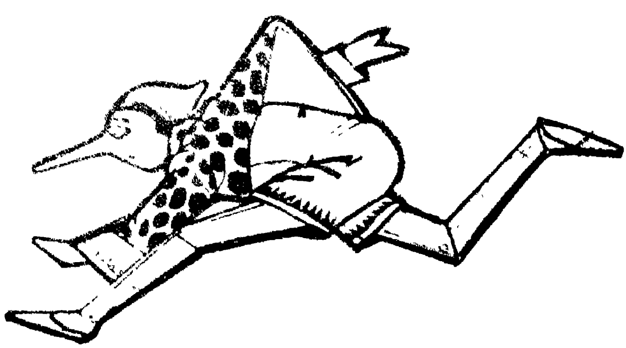
মোটকথা, সবাই মিলে সেখানে এমন তালগোল পাকালো যে, পুলিশ শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুলকে ছেড়ে দিলো। আর তার বাবা বেচারা বাটুল মিয়াকে কারাগারে নিয়ে গেলো।

বাটুল মিয়া নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনেক ধরাধরি করলো। কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। শুধু বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি করতে লাগলো।

কারাগারে গিয়েও অনেক কাঁদলো বাটুল মিয়া। কেঁদে কেঁদে দুটো চোখ ফুলে গেলো। অনেক দুঃখ করে বললো—

দুষ্টু ছেলে! আমি একটা ভালো পুতুল গড়তে চেয়েছিলাম তোমাকে। কিন্তু এখন তার উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছি। বড্ড ভুল করেছি আমি। আগেই চিন্তা করা উচিত ছিলো আমার।

তারপর, যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সব গল্প সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমি এখন তোমাদের সব বলবো।



॥ চার ॥

ভণ্ডুল ও ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ইতিহাস। বিজ্ঞজনের উপদেশ ও সংশোধনের কথা, কেমন করে দুষ্টু ছেলেদের বিরক্তি ধরায়!

আমার ছোট ছোট পাঠক পাঠিকারা, তাহলে বলছি শোনো! ওদিকে বেচারা বাটুল মিয়াকে বিনাদোষে কারাগারে নিয়ে গেলো। আর এদিকে সেই দুষ্টু ভণ্ডুল পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রাস্তা ও মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে সোজাসুজি বাড়ীর দিকে ছুটলো। পথে যেতে যেতে কখনো বা ছাগলের গায়ের উপরে, কখনো বা ছোট ছোট খাল-বিলের ভিতর দিয়ে লাফালাফি করে দৌড়ালো।

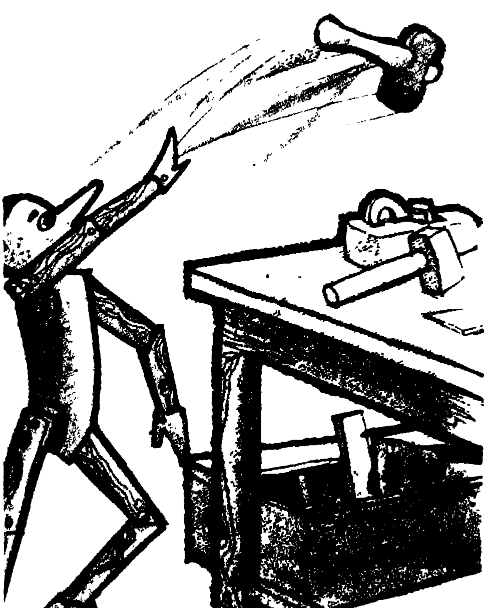
ঘরের দরজা ছিলো ভেজানো। ধাক্কা মেরে ঢুকে খিল এঁটে দিলো ভিতর থেকে। মাটিতে বসে পড়ে আনন্দের দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিন্তু সেই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়ে রইলো না। ঘরের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো—ক্রি-ক্রি-ক্রি।

—কে, কে ডাকলো আমাকে? ভণ্ডুল ভয় ভয় করে বললো।

—আমি।

ভণ্ডুল ফিরে তাকালো সেদিকে। মস্তবড় একটা ঝিঁ-ঝি পোকাকে দেখতে পেলো। সেই পোকা দেয়াল বেয়ে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছিলো।

—এই ঝিঁ-ঝি আমাকে বলো তুমি কে?



—আমি এক ঝিঁ-ঝি পোকা, যে কথা বলতে পারে। একশ' বছর ধরে এ ঘরে বাস করছি।

—আজ থেকে এঘর আমার। ওভাবে হা করে না তাকিয়ে থেকে এক্ষুণি চলে যাও এখান থেকে। পুতুল বললো।

—আমি এখান থেকে চলে যাবো ঠিকই। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা বড় 'সত্য' বলে যাবো।

—যা বলবার শীগগির করে বলো।

—ঠিক ঠিক জেনো। যেসব ছেলেমেয়েরা বাবার অমতে কাজ [illegible] খামখেয়ালী করে বাবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়—এ জগতে [illegible] কোনো শান্তি নেই। এখনই হোক অথবা পরে, এদেরকে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হতে হবেই।

—বেশ, তাহলে আপত্তি নেই। ঝিঁ-ঝি পোকা তুমি ইচ্ছে মতো ডাকো। কাল সকাল থেকে আমি আর থাকছি না এখানে।

—কেনো?

—এখানে থাকলে আমার দশাও আর সব ছেলেদের মতো হবে। তাদের মতো স্কুলে যেতে হবে। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, জোর জুলুমে পড়াশুনা করতে হবে। আমি গোপনে তোমাকে বলছি—পড়াশুনা করবার ইচ্ছে মোটেই নেই আমার। প্রজাপতির পিছনে ছুটাছুটি করে গাছে ওঠা, আর বাসা থেকে পাখীদের ছোট ছোট বাচ্চা কেড়ে নিতেই আমার আনন্দ।

—আচ্ছা বোকা ছেলেতো দেখছি! কিচ্ছু জানো না। এরকম করলে তুমি একটা মস্তবড় গাধা হয়ে যাবে যে! আর সবাই মিলে তোমাকে নিয়ে তামাশা করবে।

—চুপ করো ঝিঁ-ঝি পোকা। আমাকে অভিশাপ দিও না বলে দিচ্ছি। ভণ্ডুল ধমক দিয়ে বললো।

ধৈর্য আর জ্ঞান কোনোটাই হারালো না ঝিঁ-ঝি পোকা। ভণ্ডুলের গালি-গালাজে কিছুই মনে করলো না সে। স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলে যাচ্ছিলো।

—যদি তোমার স্কুলে যেতে ইচ্ছে না করে তবে একটা কাজ টাজ শিখছো না কেনো? এমনি করে ভালোভাবে পেট চালাতে পারবে তুমি?

আর ধৈর্য সামলাতে পারলো না ভণ্ডুল। রেগে মেগে জবাব দিলো—

—আমার মত শুনতে চাও তুমি? পৃথিবীর সমস্ত কাজের মধ্যে আমার শুধু একটা কাজ পছন্দ।

কি কাজ?

—খাওয়া, ঘুমানো। আর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হৈ হল্লা করে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়ানো।

ঝিঁ-ঝি পোকা ধীর গলায় জানিয়ে দিলো—

—তুমি শুধু এইটুকু জেনো, এ ধরনের কাজ যারা করে তাদের শেষ পরিণতি—হয় হাসপাতাল, নতুবা কারাগার।

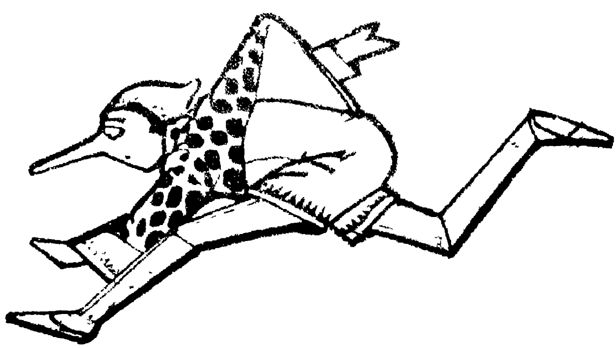
—সাবধান দুষ্টু ঝিঁ-ঝি পোকা—সাবধান! দেখো, আমার মাথাটা যেন বিগড়ে দিও না।

—বেচারা ভণ্ডুল, তোমাকে দেখে বড্ড মায়া হয় আমার।

—কেনো আমার উপরে আবার মায়া কেনো?

—তুমি যে একটা পুতুল! আর সবচেয়ে খারাপ জিনিস তোমার কাঠের মাথাটা।

এই কথা না শুনে ভণ্ডুল একেবারে আগুন হয়ে গেলো। টেবিলের উপর থেকে হাতুড়িটা নিয়ে ঝিঁ-ঝি পোকার গায়ে ছুঁড়ে মারলো। ভণ্ডুল ভেবেছিলো আঘাতটা গায়ে লাগবে না বুঝি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একেবারে মাথায় গিয়ে লাগলো। এতো জোরে লেগেছিলো যে, ঝিঁ-ঝি পোকা শুধু বলতে পেরেছিলো- ক্রি-ক্রি-ক্রি। আর সাথে সাথে দেয়ালের গায়ে ঝুলে রইলো বেচারা।



॥ পাঁচ ॥

ভণ্ডুল খিদেয় কাতর হয়ে পড়ে। একটা ডিম পেয়ে সিদ্ধ করতে যায়। সেই ডিম থেকে অদ্ভুত এক মুরগীর বাচ্চা বেরিয়ে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে জানালা পথে পালিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে রাত নেমে এলো।

ভণ্ডুল সকাল থেকে এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি। পেটের ভিতরকার জ্বালাই তাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এমনিতেই ছোটদের খিদে একটু বেশী।

খিদের মাত্রা বেড়েই চললো। কিছুক্ষণের মধ্যে এতোই প্রবল হোল যে, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না চোখে। বাঘের খিদে লেগেছে যেন। শেষ পর্যন্ত খিদের জ্বালায় নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে যাবার যোগাড়।

বেচারা ভণ্ডুল তখন চুলোর কাছে গেলো।

চুলোয় হাঁড়ি চাপানো ছিলো। ভিতরে কি আছে দেখবে বলে সে ঢাকনি তুলতে গেলো। পারলো না। পারবে কি করে? সেগুলো তো ছবি। দেয়ালের গায়ে এঁকে রাখা হয়েছে।

তখন ভণ্ডুল বেচারার অবস্থাটা যে কি দাঁড়ালো তা তোমরা বুঝতেই পারছো। তার লম্বা নাক আরো চার আংগুল লম্বা হয়ে গেলো। সামান্য কিছু খাবারের আশায় ঘরের চারিদিকে পাতি পাতি করে খুঁজলো। কমপক্ষে একটু ভাত, কিংবা যৎসামান্য রুটি, অথবা কুকুরের খেয়ে ফেলা কিছু হাড়গোড়, না হয় দাঁতের নীচে রেখে চিবোনোর মতো কিছু ফল, যা হয় একটা কিছু হোলেই হোত। কিন্তু পাওয়া গেলো না কিছু। একেবারে কিছুই নেই।

ক্রমান্বয়েই খিদের বেগ বাড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু বেচারা ভণ্ডুলের হাই তোলা ছাড়া আর কোনই গতি রইলো না। শুধু লম্বা লম্বা হাই তুলছিলো সে। মুখ, কান পর্যন্ত খুলে যাচ্ছিলো যেন।

হাই তোলার পর যখন থুতু ফেললো, মনে হোল তার পেট কোথায় উধাও হয়ে গেছে। নিরাশ হয়ে কেঁদে কেটে বললো—

—ঝিঁ-ঝি পোকা যা বলেছিলো, ঠিকই বলেছিলো। বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে এবং বাড়ী থেকে পালিয়ে খুব অন্যায় করেছি আমি। খুবই অন্যায়

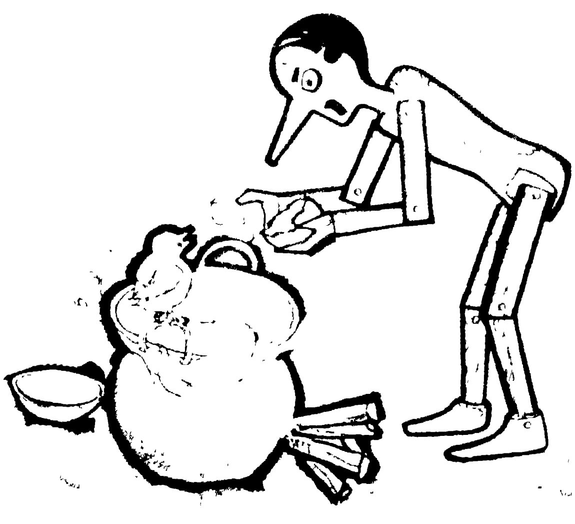


হয়েছে আমার। যদি বাবা এখন এখানে থাকতেন তবে আমাকে না খেয়ে মরতে হোত না। হায় হায়, খিদে কি খারাপ রোগ বাবা!

অবশেষে ভণ্ডুল ঘরের একপাশে জমিয়ে রাখা ময়লার গাদার মধ্যে সাদা সাদা গোল গোল কি যেন দেখতে পেলো। দেখতে অনেকটা মুরগীর ডিমের মতো। হঠাৎ সেদিকে লাফিয়ে পড়ে ঝুঁকে পড়লো সে। হ্যাঁ, ঠিক একটা ডিম। তখন যে তার কি আনন্দ তা বর্ণনা করা যায় না—শুধু মাত্র কল্পনাই করা যায়। এ যেন স্বপ্নে দেখছে সে! ডিমটাকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে চুমু খেতে খেতে বললো—

—এখন কিভাবে সিদ্ধ করি? মামলেট, না সিদ্ধ করে খাবো? না-না, তেলে ভেজেই খাবো! নাহ্, কাঁচাই খাই। ধ্যাৎ, সবচেয়ে ভালো হবে হাঁড়িতে সিদ্ধ করে খেলে। হ্যাঁ, বেশী দেরী করা যাবে না। বড্ড খিদে পেয়েছে। বলতে না বলতেই আগুন জ্বেলে ছোট্ট একটা হাঁড়িতে করে ডিমটা সিদ্ধ করতে লেগে গেলো সে।

হাঁড়ির মধ্যে তেল অথবা ঘি'র পরিবর্তে সামান্য পানি ঢেলে দিলো। পানি গরম হয়ে টগবগিয়ে উঠলো। ভণ্ডুল ডিমটার খোসা ছাড়িয়ে



তার ভিতরের অংশটুকু যেই সেই হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিলো অমনি কুসুম থেকে একটা হাসি খুশি সৌম্য মুরগীর বাচ্চা বের হয়ে এলো। ভণ্ডুলকে সালাম জানিয়ে সেই সুন্দর বাচ্চাটা বললো--

—সহস্র ধন্যবাদ, ভণ্ডুল সাহেব। তুমি আমাকে খোসা ছাড়াবার হাত থেকে বাঁচালে। বিদায়, আবার দেখা হবে। ভালো থেকো এবং তোমার বন্ধুবান্ধবকে আমার শুভেচ্ছা দিও। বলেই খোলা জানালাটার ভিতর দিয়ে কোথায় উড়ে গেলো সে।

বেচারা পুতুল তো একেবারেই অবাক। অপলক চাহনি আর মুখ খোলা অবস্থায় ডিমের খোসাটি হাতে করে অজ্ঞান হয়ে রইলো। জ্ঞান ফিরে এলে কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পা' দাপাতে লাগলো। আর নিরুপায় হয়ে বললো—

—হ্যাঁ, ঝিঁ-ঝি পোকা যা বলেছিলো, ঠিকই বলেছিলো। যদি আমি বাড়ী থেকে না পালাতাম এবং আমার বাবার কাছে থাকতাম; অন্তত খিদেয় মরতে হোত না আমাকে। খিদে কি ভয়ানক রোগ!

এদিকে পেট খিদেয় ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। কি দিয়ে যে জ্বালা মিটাবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না ভণ্ডুল।

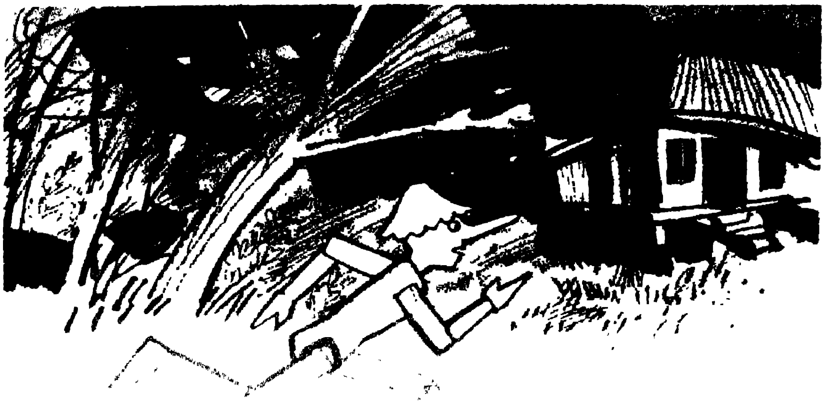
অবশেষে ঠিক করলো—ঘরে বসে থাকা চলবে না তার। কাছাকাছি কোনো গ্রামে যাবে। সেখানকার দয়ালু ভালোমানুষগুলোর কাছ থেকে কিছু চেয়েচিন্তে খাবে। এখন এটাই তার একমাত্র আশা ভরসা।

।। ছয় ।।

ভণ্ডুল উনুনে পা' রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে জেগে উঠে দেখে তার পা পুড়ে গেছে।

সে রাতটা ছিলো নরকের মতো ভয়াবহ রাত।

মেঘ ডাকছিলো জোরে জোরে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো ঘন ঘন। আগুনে আগুনে যেন ভরে গেছিলো আকাশটা। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস শোঁ শোঁ করে বইছিলো। মেঘের মতোই এসে ঢেকে দিলো অজস্র ধূলোবালি। বাতাসের দাপটে মাঠের গাছপালাগুলো মাটির সংগে মিশে গেলো।



বজ্র আর বিদ্যুৎ এই দুটোকেই খুব বেশী ভয় করতো ভণ্ডুল। তবুও তখন খিদের জ্বালাটাই ভয়ের চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। তার জিভ অনেকখানি বাইরে। মোটা মোটা নিশ্বাস নিচ্ছিলো শিকারী কুকুরের মতো। যতোদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার আর মরুভূমি। এছাড়া কিছুই দেখা গেলো না। দোকানপাট, বাড়ীঘরের জানালা-দরজা সব কিছু বন্ধ। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। সে যেন কোনো মৃতদের দেশ। খিদের তাগিদে অধৈর্য হয়ে শেষকালে ভণ্ডুল কোনো এক বাড়ীর দরজায় গিয়ে পর পর আঘাত করতে লাগলো। তার ধারণা ছিলো কেউ বের হয়ে আসবে নিশ্চয়ই। পরক্ষণেই এক বুড়োকে দেখা গেলো সেখানে। জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে দেখছিলো ওকে। সেতো রেগেই আগুন। ভণ্ডুলকে লক্ষ্য করে উঁচু গলায় বললো—

—কে তুমি? কি চাও এই অসময়ে?

– দয়া করে আমাকে এক মুঠো চাল দেবেন?

—আসছি, অপেক্ষা করো একটু। সেই বুড়ো জবাব দিলো।

বুড়ো ভেবেছিলো নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু ছেলে-টেলে হবে। ঘরে ঘরে গিয়ে অযথা লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে বিরক্ত করছে।

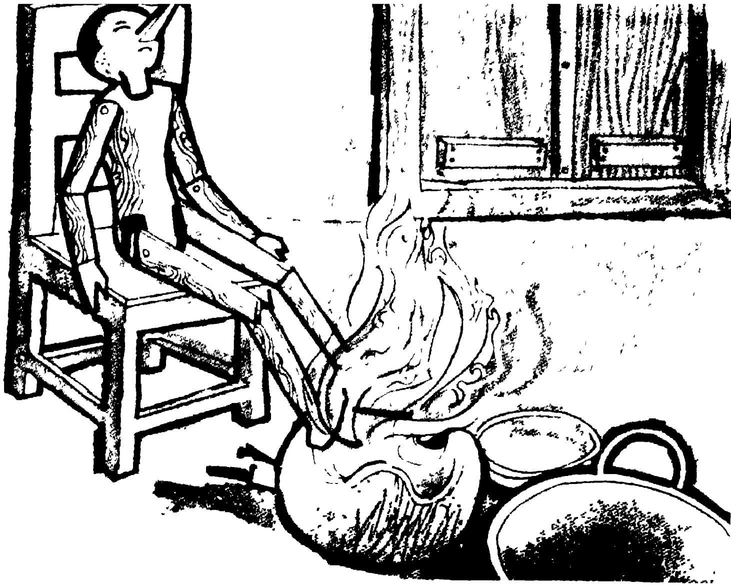


কয়েক মিনিট পরেই জানালা খুলে গেলো আবার। সেই বুড়োর গলা শোনা গেলো। ভণ্ডুলকে ডাকছে চিৎকার করে.

—এদিকে এসো। তোমার টুপিটা পেতে দাও।

কাছে গেলো ভণ্ডুল। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়েই গেলো। টুপিটা ভালো করে পেতে ধরলো। ভিক্ষা নেবে বলে। কিন্তু যেই না পেতেছে টুপি অমনি বড় এক বালতি পানি ঝপাৎ করে তার গায়ে এসে পড়লো। মাথা থেকে পা' পর্যন্ত একেবারে ভিজে গেলো সব।

আহা বেচারা ভণ্ডুলের তখন কি দুর্দশা! একটা ভেজা বেড়ালের মতো বাড়ী ফিরে গিয়ে খিদেয় আর ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে পড়লো। দাঁড়াবার শক্তিটুকুও আর রইলো না তার। বসে বসে ভিজে পা দুটো চুলোর আগুনে শুকাতে লাগলো। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বুজে এলো ওর। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ওখানেই।



ভণ্ডুল ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ আগুন ধরে গেলো তার কাঠের পায়ে। ধীরে ধীরে দুটো পা-ই পুড়ে কয়লা থেকে ছাই হয়ে গেলো।

এদিকে কিন্তু ভণ্ডুল সাহেব নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে তখনো। কিছুই টের পায়নি সে। যেন পা দুটো তার নয়, অন্য কারো।

অবশেষে সকাল হোল। কেউ দরজা ধাক্কিয়ে জাগালো তাকে।—

—ভণ্ডুল ওঠো, বেলা হয়ে গেছে অনেক।

—কে? হাই তুলে চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলো ভণ্ডুল।

—আমি। একটা জবাব এলো।

গলাটা ছিলো বাটুল মিয়ার।

। সাত ।।

বাটুল মিয়া ঘরে ফিরে আসে। পুতুলের পা আবার নতুন করে তৈরী করতে শুরু করে। আর নিজের নাস্তা পুতুলকে খেতে দেয়।

বেচারা ভণ্ডুল ঘুমের ঘোরে চোখ পুরোপুরি খোলেনি। টের পায়নি তার পা পুড়ে গেছে। বাবার গলা শুনতেই চেয়ার থেকে হুড়-মুড় করে লাফিয়ে পড়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেলো। দরজা খুলতে

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু চোখভরা ঘুম তো! দু' তিনবার টলে টলে মেঝের উপর পড়ে গেলো। মাটিতে পড়েই সে কি চিৎকার!

—দরজা খুলে দাও। রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো বাটুল মিয়া।

—পারছি না যে বাবা। পুতুল কেঁদে কেটে মাটিতে গড়াগড়ি করে জবাব দিলো।

—কেনো পারছোনা?

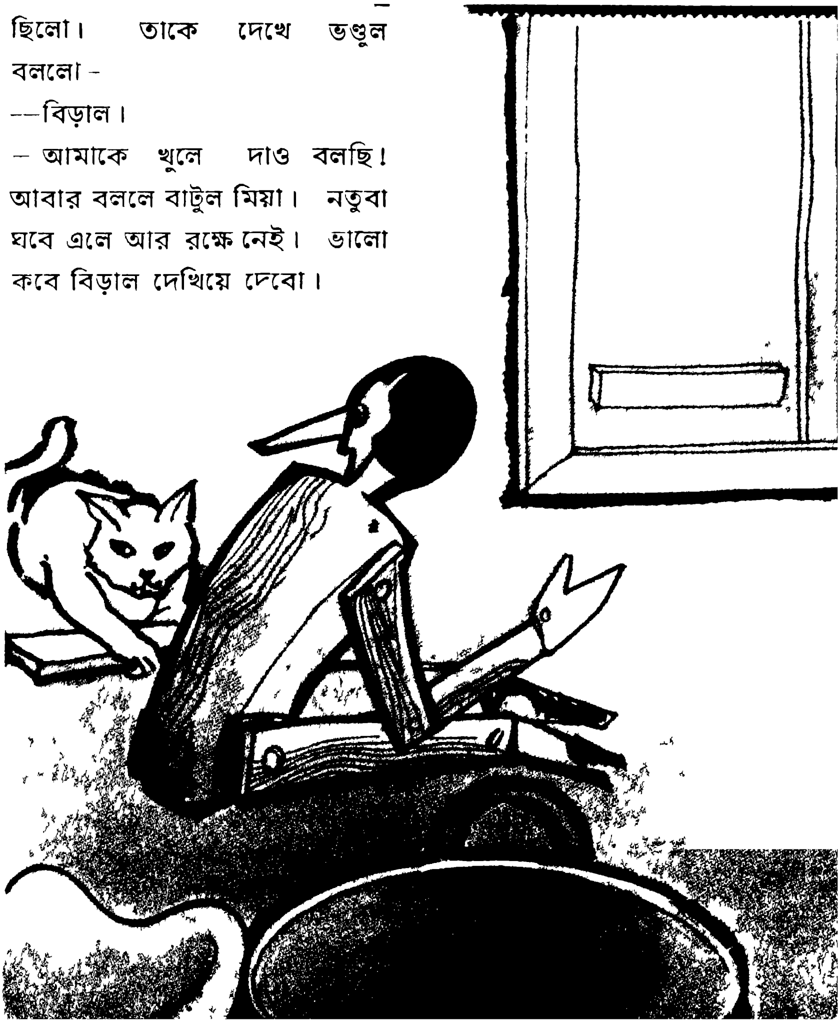
—আমার পা খেয়ে ফেলেছে।

—কে, কে খেয়ে ফেলেছে তোমার পা?

একটা বিড়াল পুতুলের পাশেই একখণ্ড কাঠ নিয়ে খেলা করছিলো। তাকে দেখে ভণ্ডুল বললো -

—বিড়াল।

—আমাকে খুলে দাও বলছি! আবার বললে বাটুল মিয়া। নতুবা ঘরে এলে আর রক্ষে নেই। ভালো করে বিড়াল দেখিয়ে দেবো।



—আমাকে বিশ্বাস করো বাবা। দাঁড়াতে পারছি না আমি। হায় হায়, সারাটা জীবনই বুঝি আমাকে এভাবে হাঁটু দিয়ে চলতে হবে।

বাট্টুল মিয়া কিন্তু ভাবলো অন্যরকম। পুতুলের অমন করে কান্নাকাটি তার দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর একটা বিহিত করা দরকার। তাই সে জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঘরে ঢুকেই দেখে তার প্রাণের ভণ্ডুল মাটিতে লুটিয়ে। আর সত্যি সত্যিই তার পা' নেই। একেবারেই দমে গেলো সে। পুতুলকে গালিগালাজ কিংবা মারধর কোনোটাই করা হোল না। বরং তক্ষুণি গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেয়ে আদর করতে লাগলো। নানাভাবে সান্ত্বনা দিলো। তার চোখ দিয়ে পানি গড়াতে দেখা গেলো। কাঁদ কাঁদ হয়ে বললো—

—ছোট্ট ভণ্ডুল আমার! কেমন করে তোমার পা পুড়লো বাবা।

—আমি জানি না বাবা। বিশ্বাস করুন, আজকের রাতটা একটা নরকের রাতের মতো কেটেছে আমার। যতোদিন বেঁচে থাকবো মনে থাকবে একথা। মেঘ ডাকছিলো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। আমার খুব ভয় লাগছিলো তখন। এদিকে আমি ভয়ে বাঁচি না। আর ওদিক থেকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! বদমায়েশ ঝিঁ-ঝি পোকাটা ডেকে বললো ভালোই হোল। তুমি যেমন দুষ্টুছেলে তেমন উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছো। আমি কিন্তু ছাড়িনি বাবা। আমি বললাম—সাবধান ঝিঁ-ঝি পোকা। আমার দিকে সে ঘাড় ফিরিয়ে বললো 'তুমি পুতুল। তোমার তো কাঠের মাথা।' আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। তক্ষুণি তার গায়ে হাতুড়ি ছুঁড়ে মারলাম। সে মরে গেলো। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ তার। আমি তাকে ইচ্ছে করে খুন করতে চাইনি। তার যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে আমার কাছে। তখন আমার পেটে দারুণ খিদে। মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করছিলো। তারপর, আমি ডিম সিদ্ধ করতে চুলোয় হাঁড়ি চাপিয়েছি। হঠাৎ সেই ডিম থেকে মুরগীর বাচ্চাটা বের হয়েই পালাতে পালাতে বললো -'আবার দেখা হবে। তোমার বন্ধু-বান্ধবকে আমার শুভেচ্ছা দিও।' তখন খিদে আরো চরমে এসে পৌঁছেছে। পেট জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। না পেরে গেলাম সেই ছোট্ট বুড়োর কাছে। সে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়লো আমার দিকে। বললো 'কাছে এসো। তোমার টুপিটা পেতে দাও।' আমি টুপি পেতে

দিলাম তার কথা মতো। সে ঝপাৎ করে এক বালতি পানি ঢেলে দিলো আমার গায়ে। আমি ভিজেপুড়ে সেখান থেকে চলে এলাম। আর পা দুটো উনুনে শুকাতে দিলাম। ঠিক এই সময়ে আপনি ফিরে এলেন। এখন দেখি আমার পা পুড়ে গেছে। এদিকে পেটের খিদে। আবার ওদিকে পা নেই। হায়-হায়, কি যে করি!

বাবাকে কথাগুলো বলে বেচারা ভণ্ডুল তো কেঁদেই অস্থির। খুব জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। পাঁচ মাইল দূর থেকেও যেন শোনা যাচ্ছিলো সে কান্না।

বাটুল মিয়া তো হতবাক! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না সে। তার পুতুল খিদেয় মরে যাচ্ছে। তাই পকেট থেকে তিনটে নাশপাতি বের করে বললো—

—ন'ও বাবা ভণ্ডুল। এই নাশপাতিগুলো আমার নাস্তার জন্যে রাখা ছিলো। এখন খুশি হয়ে তোমাকে দিচ্ছি। খাও। খোদা তোমার ভালো করুন!

—যদি একান্তই এই নাশপাতি আমাকে খাওয়াতে চান তবে দয়া করে খোসা ছাড়িয়ে দিন।

—খোসা ছাড়িয়ে দিতে হবে! ফিরে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো বাটুল মিয়া। ছেলে, কোনোদিন আমি বিশ্বাস করিতে পারিনি তোমার এতোটা অধঃপতন হ'তে পারে। তুমি জানো না বাচ্চা, কোনো খাবারকেই



তুচ্ছ করতে নেই। এখন থেকেই তোমাদের এ জগতের সব রকম খাবারের অভ্যাস রাখতে হবে। কার জীবন কখন কিভাবে কাটবে আমাদের জানা নেই কারো।

—আপনি ঠিকই বলেছেন বাবা। কিন্তু আমি খোসা শুদ্ধ কোনো ফল কখনো খাবো না। আমার পেটে ওসব সহ্য হয় না।

ভণ্ডুলের কথা শুনে তখন সেই ভালো মানুষ বাটুল মিয়ার মনে মনে ভীষণ রাগ হোল। কিন্তু কোনো রকমে নিজেকে সামলিয়ে নিলো সে। তারপর একটা ছোট ছুরি দিয়ে নাশপাতিগুলোকে ছিঁলে খোসাগুলো টেবিলের একপাশে রেখে দিলো।

টেবিলের উপর থেকে প্রায় ছোবল মেরেই একটা নাসপতি তুলে নিলো ভণ্ডুল। সেটাকে খেয়ে বিচি ফেলে দিতে যাবে ঠিক তখন বাটুল মিয়া হাত ধরে বসলো।

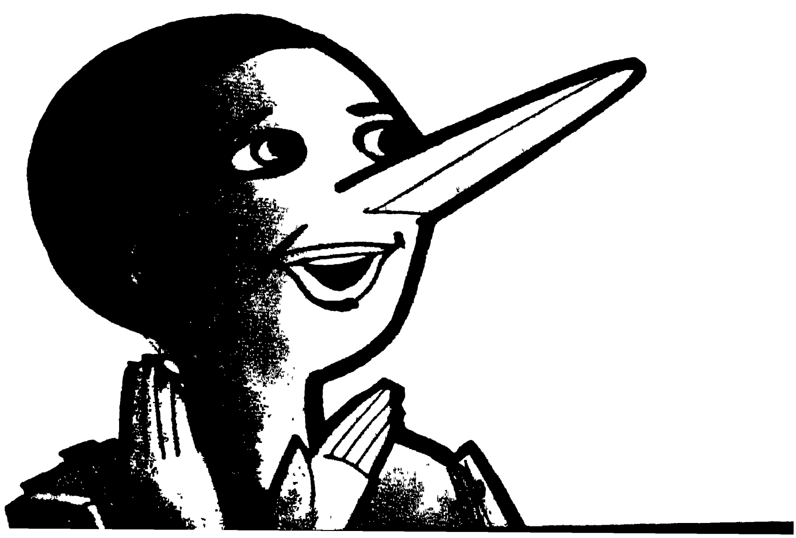
—ফেলে দিও না। এই জগতের সব কিছুই উপকারে আসতে পারে।

—কিন্তু বিচি আমি কোনোদিনই খাই না। পুতুল চেঁচিয়ে উঠলো আর রাগে সাপের মতো গজরাতে লাগলো।

— কখন কার জীবনে কি আসে কে জানে। বাটুল মিয়া শান্ত গলায় বললো আবার।

কাজেই বিচিগুলো আর বাইরে ফেলা সম্ভব হোল না। খোসার সংগেই সেগুলো টেবিলের উপরে রেখে দিলো।

এদিকে ভণ্ডুলের সেই নাশপাতি খাওয়া শেষ। একে খাওয়া বলা চলে না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি বলা যায়—গিলে ফেললো। তারপর লম্বা একটা হাই তুলে কেঁদে কেঁদে বললো—



—আমার পেটে এখনো অনেক খিদে।

—কিন্তু বাবা, তোমাকে খেতে দেবার মতো যে আর কিছুই নেই আমার কাছে !

— সত্যিই কিছু নেই ?

—নাশপাতির ওই খোসা আর বিচিগুলো ছাড়া তো আর দেখছি না কিছু।

—বেশ। ভণ্ডুল বললো। যদি কিছুই না থেকে থাকে তবে ওগুলোই খাবো। বলেই সেগুলো তুলে তুলে চিবাতে লাগলো।

প্রথমটার বেলায় খেতে খেতে মুখ সিটকালো। পরে আরেকটা নিয়ে খেলো। আবার আরেকটা। শেষ পর্যন্ত খোসাগুলো সবই সাবাড় করে বিচিগুলোও খতম করে তবে ছাড়লো। তারপর খুশি হয়ে হাত দুটোকে পেটে বুলিয়ে একটু নেড়েচেড়ে বললো—

—এখন কিছুটা ভালো লাগছে।

বাটুল মিয়া মাথা দুলিয়ে বললো—

—বুঝেছো ? আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম। সব রকম খাবার খেয়ে অভ্যাস করা ভালো। মাণিক আমার, কোনো কিছুকে অবহেলা করতে নেই। জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে। কেউ বলতে পারে না খোদা কার কপালে কখন কি রেখেছে।

॥ আট ॥

বাটুল মিয়া ভণ্ডুলের পা তৈরী করে ফেলে। নিজের কোট বেচে দিয়ে ছেলের পড়ার জন্যে বর্ণমালা কিনে আনে।

খিদের হাত থেকে রেহাই পেলো পুতুল। এখন বাবার কাছে বায়না ধরলো নতুন দুটো পায়ের জন্যে।

কিন্তু বাটুল মিয়া অস্বীকার করলো। চট্ করে রাজী হলো না সে। পুতুলকে তার দুষ্টুমির একটু শাস্তি পাওয়া উচিত। অন্তত এবেলা কান্নাকাটি করে বুঝুক দুষ্টুমি করার পরিণামটা। যা হয় পরে দেখা যাবে। সে একটু কড়া মেজাজ দেখিয়ে বললো—

—আবার কেনো তোমার পা করে দেবো? তা আমি পারবো না। যদি তুমি ঘর ছেড়ে আবার পালিয়ে যাও!

আগের মতোই বায়না ধরলো পুতুল। বললো,

—এবারে দিব্যি করে বলছি -আজ থেকে ভালোভাবেই থাকবো।

বাটুল মিয়া উত্তর দিলো—

—কোনো কিছু আদায় করবার বেলায় সব ছেলেরাই অমনি প্রতিজ্ঞা করে থাকে।

—সত্যিকরে বলছি বাবা! আমি ইসকুলে যাবো। রীতিমতো পড়াশুনা করবো। আপনার অবাধ্য হবো না কখনো।

—রাখো তোমার কথা। কোনো কিছু আদায় করতে গিয়ে সব ছেলেরাই অমনি বলে থাকে।

—কিন্তু আমি অন্য ছেলেদের মতো নই বাবা। আমি সবার চেয়ে ভালো। সব সময় সত্যি কথা বলি। একেবারে দিব্যি করে বলছি বাবা আমি একটা কাজ-কাম শিখবোই। আপনার সান্ত্বনা হবো। বুড়ো বয়েসের লাঠি হয়ে থাকবো।

বাটুল মিয়ার মনে হোল কে যেন এসে তার মুখে কালো কালির একটা ছাপ এঁকে দিয়ে গেলো। চোখ দুটো টলমল ছলছল করে উঠলো। ভণ্ডুলের অমন অবস্থা দেখে কান্না এলো তার। স্নেহের মায়ায় প্রাণটা ভরে গেলো একেবারে। মুখে কোনোই জবাব দিলো না সে। শুধু কাজের যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে নিলো। আর দুটো কাঠের টুকরো নিয়ে অতি আগ্রহে পা দুটো তৈরী করতে লেগে গেলো।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পা তৈরী হয়ে গেলো। দুটো পা-ই একটু খাটো, শুকনো ও চঞ্চল। কোনো সুদক্ষ কারিগরের হাতে তৈরী যেন। বাটুল মিয়া পুতুলকে আদেশ করে বললো—

—চোখ বন্ধ করে ঘুমাও!

তক্ষুণি চোখ বন্ধ করে ঘুমাবার ভান করলো ভণ্ডুল। এমনি জেগে জেগে যখন ঘুমাচ্ছিলো সে, তখন বাটুল মিয়া একটা ডিমের খোসায় করে কিছু আঠা ঢেলে নিলো। আর আঠাগুলো সেই নতুন দুষ্টু পা দুটোয় মাখালো। এমন সুন্দর করে মাখালো যে লাগাবার চিহ্নটুকুও পর্যন্ত রইলো না।

পুতুল যখন টের পেলো সে দুটো পা-ই ফিরে পেয়েছে—তখন তার আনন্দ দেখে কে! একলাফে টেবিল থেকে একদম নীচে নেমে এলো। খুশিতে পাগলের মতো নাচতে শুরু করে দিলো। ডিগবাজী খেতে লাগলো ঘন ঘন। বাবাকে বললো—

—আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে এক্ষুণি ইস্‌কুলে যেতে চাই।

—চমৎকার ছেলে।

—কিন্তু ইস্‌কুলে যেতে হলে আমার পোশাকের দরকার।



বাটুল মিয়া ছিলো গরীব। কাজেই তার পকেটে পয়সা ছিলো না তখন। পাতলা রঙীন কাগজ দিয়ে একটা ছোটোখাটো পোশাক তৈরী করলো সে। গাছের ছাল থেকে একজোড়া জুতা, আর রুটি দিয়ে তৈরী করলো ছোট একটা টুপি।

পোশাক পরেই এক বালতি পানির কাছে গেলো ভণ্ডুল। পানিতে নিজের সুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখে খুশি হোল খুব। মনে তার ভীষণ গর্ব তখন। হঠাৎ বলেই ফেললো—

—আহ্, আমি এখন দেখতে ঠিক একটা সাহেবের মতো।

বাটুল মিয়া তাই শুনে জবাব দিলো—

—ঠিক, ঠিক বলেছো বাবা। তুমি দেখতে একটা সাহেবের মতোই। কিন্তু মনে রেখো, সুন্দর কাপড় পরলেই সাহেব হওয়া যায় না। কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখতে হবে।

পুতুল প্রতিউত্তরে বললো—

—কিন্তু ইস্‌কুলে যাবার জন্যে তো আরো কিছু চাই বাবা। একান্ত যা বেশী প্রয়োজন অন্তত সেগুলো।

—মানে?

—ধরুন; ক, খ শিখবার বর্ণমালা। সেটা তো একান্ত দরকার।

—ঠিক কথা বলেছো। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?

—বলা খুবই সহজ। বইয়ের দোকান থেকে কিনতে হবে!

—আর পয়সা?

—আমার কাছে নেই।

—আমার কাছেও তো নেই। সেই সরল বৃদ্ধটি বললো মুখভার করে। এতো হাসি খুশির থেকে হঠাৎ করে ভণ্ডুলের মুখখানা কেমন কালচে হয়ে গেলো। দরিদ্রতা যখন ঠিক দরিদ্রতা হয় সবাই বুঝতে পারে তখন। ছোট্ট শিশুও।

—যাক। বলে উঠে দাঁড়ালো বাটুল মিয়া। তারপর তার তালিওয়ালা ছেঁড়া কোটটা গায়ে পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।



কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো সে। তার হাতে একখানা বর্ণমালা। কিন্তু গায়ের সেই ছেঁড়া কোটটি আর দেখা গেলো না।

সত্যিই বেচারা বাটুল মিয়ার জন্যে কার না মায়া হয়? তার গায়ে একটা পাতলা জামা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এদিকে দারুণ শীত।

—বাবা তোমার কোট?

—বেচে দিয়েছি।

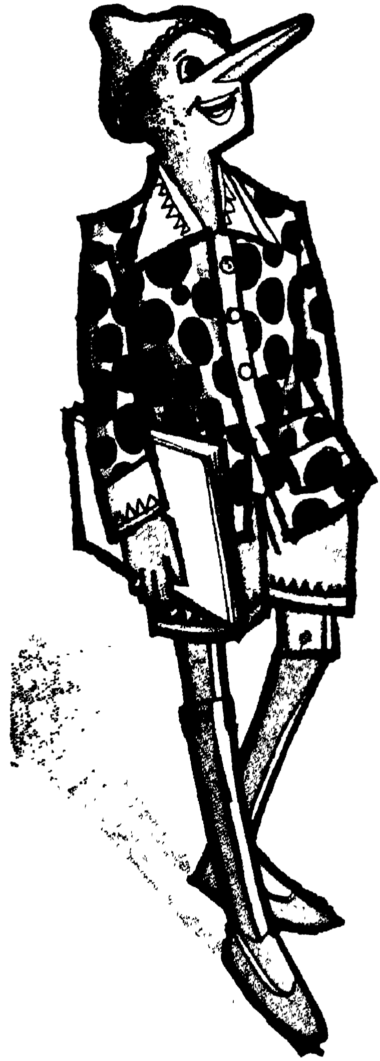
—সেকি! কেনো বেচতে গেলে?

—খুব গরম লাগছিলো।

ভণ্ডুল কিন্তু অনুমান করে ঠিকই বুঝতে পারলো তখন। তার ছোট্ট ও সহজ প্রাণ বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ভরে গেলো। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলোনা সে। বাবার গলা জড়িয়ে ধরলো। মুখে চুমু খেতে লাগলো বারবার।

॥ নয় ॥

ভণ্ডুল তার বর্ণমালা বেচে সেই পয়সা দিয়ে পুতুল খেলা দেখতে গেলো।



শীত প্রায় শেষ হয়ে এলো।

একদিন ভণ্ডুল তার পড়ার বই বর্ণমালা বগলদাবা করে ইস্‌কুলের পথে পা বাড়ালো। পথিমধ্যে তার ছোট্ট মগজে হাজারো চিন্তা এসে ঘিরে দাঁড়ালো। আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবলো সে। বিবেকের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলছে।

—আজ ইস্‌কুলে গিয়ে সবগুলো অক্ষর শিখতে চাই। কাল লেখা শিখবো। পরশু অংকের যাবতীয় অক্ষরগুলো শিখতে হবে। তারপর উপযুক্ত হয়ে অনেক অনেক টাকা পয়সা রোজগার করবো। প্রথমে যে টাকা পাবো তা দিয়ে বাবার জন্যে তৈরী করবো সুন্দর দেখে একটা উলের কোট। নাহ্, উলের নয় রূপোর অথবা সোনার। বেশ চকচকে বোতাম হবে তার। বেচারা বাবা এগুলো আমার কাছে পাবার যোগ্য। কেননা, তিনি আমাকে পড়াতে গিয়ে বই কেনার জন্যেই এখন বিনাকোটে চলছেন। অথচ এখনো কতো শীত। শুধু বাবারাই এমন কষ্ট করতে পারেন।

এমনি নানা জল্পনা কল্পনা করতে করতে চলছে ভণ্ডুল। সহসা দূর থেকে বাঁশী অথবা অমন একটা কিছুর বাজনা ভেসে এলো তার কানে—পি-পি-পি-পি-ঝম-ঝম-ঝম-ঝম।

দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছিলো ভণ্ডুল। শব্দগুলো ভেসে আসছিলো বড় রাস্তাটার শেষ প্রান্ত থেকে। রাস্তাটি একটা ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে সোজা চলে গেছে সমুদ্রের কাছাকাছি।

—কিসের বাজনা বাজছে ? দুঃখের বিষয় আমার ইস্কুলে যেতে হবে। নইলে ....

ভণ্ডুল ইতস্তত করছিলো। কি করা যায় এখন ? অথচ যে-কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। হয় ইস্কুলে নতুবা বাজনা শুনতে যেতে হবে।

—নাহ্, আজ বাজনা শুনতেই যাই। কাল না হয় ইস্কুলে যাবো। ইস্কুলে যাবার সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছেনা !

তখন সেই দুষ্টু ছেলে ভণ্ডুল ঘাড় দুলিয়ে ইস্কুলে না যাবার সিদ্ধান্তই নিলো। সংগে সংগে বাজনার রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে এগোতে লাগলো। যতোই সামনের দিকে চলছে ভণ্ডুল বাজনাগুলো ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠছে বেশী করে। পি-পি-পি-ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্।

যেতে যেতে অবশেষে একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়লো সে। লোকে লোকারণ্য সেই মাঠ। সবাই এগিয়ে চলেছে একটা কাঠের ঘরের দিকে। নানা রঙের কাপড় দিয়ে সাজানো ঘরটি। সেই গ্রামেরই একটা ছোট ছেলেও দাঁড়িয়ে সেখানে। ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করলো তাকে।

—ওটা কিসের ঘর ভাই ?

—ওইতো কাগজে লেখা রয়েছে। পড়েই দেখো না।

—পড়তাম। কিন্তু আজ পারছি না। আমি এখনো পড়তে জানি না।

—চমৎকার গরু তুমি ! দাঁড়াও আমি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। জানো ? ওই কাগজে আগুনের মতো লাল লাল হরফে লেখা হয়েছে—'পুতুলের খেলা'।

—অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছে নাকি ?

—না। এইতো এক্ষুণি আরম্ভ হচ্ছে।

—ভিতরে যেতে ক' পয়সা লাগে ?

—বিশ পয়সা।

ভণ্ডুল তখন ঢুকবার জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়লো। লাজলজ্জা ছেড়ে দিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো—

—কাল পর্যন্ত আমাকে বিশটা পয়সা ধার দেবে ?

—খুব খুশি হয়েই দিতাম। সেই ছোট্ট ছেলেটি জবাব দিলো ঠাট্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দিতে পারছি না।

—তবে বিশ পয়সার বদলে আমার এই গায়ের কোটটা বিক্রি করে দিচ্ছি। পুতুল বললো ছেলেটাকে।

—তোমার ওই রঙীন কাগজের কোট দিয়ে কি করবো আমি ? বিষ্টিতে ভিজে গেলে শেষ পর্যন্ত আর গা থেকে তোলা যাবে না। উল্টো মুশকিলে পড়তে হবে তখন।

—আমার জুতা কিনবে ?

—হ্যাঁ, কিনবো না কেনো। আগুন জ্বালাবার জন্যে খুব ভালো হবে।

—আমার টুপির জন্যে কতো দেবে ?

—চমৎকার বেচাকেনা দেখছি! তোমার টুপিতো ময়দার রুটির তৈরী। কাজ নেই বাবা। ইঁদুরেরা তাহলে মাথার উপরে উঠে খেতে আসবে।

এখন কি যে করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেনা ভণ্ডুল। বেচারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। অন্য কোনো প্রস্তাব করতেও সাহস হোল না তার। কি জানি আবার কি জবাব মেলে। এসব সন্দেহ আর ইতস্তত মিলে উদ্বিগ্ন করে তুললো তাকে। অবশেষে ভেবে চিন্তে বললো—

—এই বর্ণমালার বদলেও বিশটা পয়সা দেবে না ?

—দেখো, আমি নিজেই ছেলে মানুষ। অন্য কোনো ছেলে মানুষের কাছ থেকে কিছুই কিনবো না। সেই ছোট্ট অথচ ভণ্ডুলের থেকে জ্ঞানী ছেলেটা জবাব দিলো।

পাশেই ছিলো এক দোকানী। পুরানো কাপড় চোপড় [illegible] ওদের কথাবার্তা সবই শুনে ফেললো। চেঁ[illegible]



—বিশ পয়সা দিয়ে আমি কিনে নিচ্ছি, দাও।
সেই মুহূর্তে ভণ্ডুল বর্ণমালাটি দোকানীর কাছে বিক্রি করে দিলো।
এখন তোমাদের ভাববার বিষয় রয়েছে। বেচারা বাটুল মিয়া তার ছেলের বই কিনবার জন্যে নিজের গায়ের কোটটাই বিক্রি করে দিলো। আহা, না জানি ঘরে বসে শীতে কতো কষ্ট পাচ্ছে সে। আর এদিকে ছেলে তার কি কাজটাই না করে বসলো!

॥ দশ ॥

পুতুলরা তাদের ভণ্ডুল ভাইকে চিনতে পেরে বিপুল অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু খেলোয়াড় মাস্টার ইয়াংকি বের হয়ে এসে পুতুলকে আগুনে ফেলতে চায়।

ভণ্ডুল সেই পুতুলখেলা দেখতে গেলো। ভিতরে ঢুকতেই একটা আজব গণ্ডগোলের সম্মুখীন হোল সে। জানা ভালো, পুতুলখেলা শুরু হয়ে গিয়েছিলো তখন। মঞ্চের উপরে 'ঝুনঝুনি' আর 'ঠুনঠুনি' এই পুতুল দুটোকে দেখা যাচ্ছিলো। পরস্পর ঝগড়া করছিলো ওরা।
অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুষাঘুষি, লাথালাথি থেকে ভীষণ মারামারিতে পরিণত হোল।



লোকজন খুব মন লাগিয়েই শুনছিলো কিন্তু। আর তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে হেসে মরছিলো। সেকি ঝগড়া আর গালাগালি পুতুল দুটির! এমনভাবে মুখ খারাপ করে গালিগালাজ করছিলো যেন দুজনেই সত্যিকারের মানুষ ওরা।

হঠাৎ কি দিয়ে কি হয়ে গেলো। ঝুনঝুনি তার পালা বলা দিলো বন্ধ করে। সে দর্শকদের শেষের দিকে তাকিয়ে আংগুল দিয়ে কি যেন দেখালো। তারপর সাংঘাতিকভাবে চেঁচাতে শুরু করে দিলো।

—হায় খোদা আমি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি? ওই যে ভণ্ডুল না?

ঠুনঠুনি বললো—

—হ্যাঁ, সত্যিই তো ভণ্ডুল।

দর্শকদের ভিতর থেকে একজন স্ত্রীলোক বলে উঠলো—

—হ্যাঁ, ভণ্ডুল।

তক্ষুণি পুতুলরা সবাই এসে একে একে মঞ্চের উপর জড়ো হোল। আর ভণ্ডুল বলে সে কি চিৎকার, ডাকাডাকি!

—হ্যাঁ, ওইতো ভণ্ডুল। আমাদের ভাই ভণ্ডুল। ভণ্ডুলের জয় হোক।

ঠুনঠুনি উচ্চস্বরে ডাকলো—

—ভণ্ডুল এখানে চলে এসো। তোমার কাঠের ভাইদের আলিংগন নিতে এসো।



এমনি মধুর আমন্ত্রণে ভণ্ডুল সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলো না। এক লাফে একেবারে মঞ্চের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। অন্য লাফে পরিচালকের মাথায় এবং সেখান থেকে আরেক লাফে একদম মঞ্চের উপরে গিয়ে উঠলো। তারপর একজন আরেকজনকে আলিংগন, চুম্বন, খাম্‌চা-খাম্‌চি, মাথায় মাথায় ধাক্কা-ধাক্কি, সে যে কতো কি তা বলে শেষ করা যায় না। সে এক আজব দৃশ্য!

এদিকে দর্শকদের মধ্যে কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোল। খেলা বন্ধ হওয়ায় ক্ষেপে গেলো তারা। চিৎকারের পর চিৎকার জুড়ে দিলো।

—খেলা দেখাও। খেলা চাই।

বৃথাই চেঁচালো তারা। দর্শকদের কোলাহলের কাছে তাদের গলা এক-রকম চাপাই পড়ে গেলো।

পালা করার পরিবর্তে পুতুলদের সোরগোল এদিকে তখনো চলছে। ভণ্ডুল নিজের কাঁধে অন্যান্য পুতুলদের কেউ কেউকে নিয়ে জয় জয় করে রাগান্বিত দর্শকদের সামনে রঙ তামাসা শুরু করে দিয়েছে।

অবশেষে খেলোয়াড় সাহেব বের হয়ে এলেন। ভদ্রলোক দেখতে এতো মোটা আর কুশ্রী যে তাঁকে দেখলেই ভয় লাগতো। তাঁর দাঁড়িতে যেন কালো কালি লেপে দিয়েছে কেউ। লম্বায় একেবারে মুখ থেকে মাটি পর্যন্ত। শোনা যায়, যখন তিনি হাঁটাচলা করতেন পায়ে বেঁধে হোঁচট খেতেন প্রায়ই। এজন্যে চলার সময় যতদূর সম্ভব দাঁড়িগুলো সামলিয়ে নিয়ে চলতেন। আর প্রকাণ্ড মুখটাকে দেখলে তো একটা গুহার মতোই মনে হোত। জ্বলন্ত হ্যারিকেনের লাল চিমনির মতো ছিলো চোখ। হাতে ছিলো একটা চকচকে চাবুক। সাপ আর নেকড়ে বাঘের লেজ দিয়ে তৈরী যেন। খেলোয়াড়ের এই অস্বাভাবিক চেহারা আর বেশভূষা দেখে সবাই বিস্মিত হোল। ভয়ের চোটে নিশ্বাস টানলো না কেউ। সবাই চুপচাপ। একটা মশার ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিলো না।

আসলেই লোকটাকে ভয় করতো পুতুলরা সবাই। কি ছেলে আর কি মেয়ে, সবাই ঝরাপাতার মতো কাঁপতো থর থর করে।

মঞ্চে এসেই খেলোয়াড় রাক্ষসের মতো মোটা গলায় ভণ্ডুলকে জিজ্ঞেস করলো—

—কেনো তুমি আমার মঞ্চে এসে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছো?

—আমাকে বিশ্বাস করুন মশাই। কোনোই দোষ না আমার।
—চুপ! দাঁড়াও আজ রাতেই এর বিচার হবে।

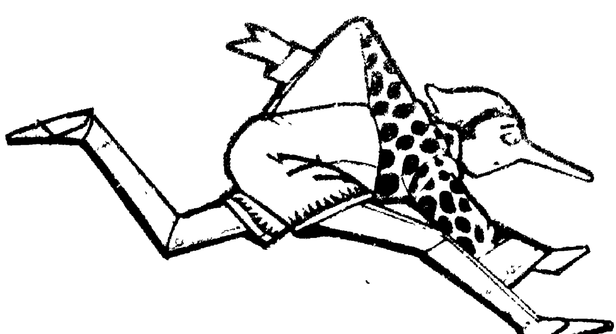
খেলা শেষে খেলোয়াড় গেলেন খাবার ঘরে। ওদিকে ছাগলের গোশ্‌ত রান্না হচ্ছিলো বাবুর্চিখানায়। হাঁড়ির মধ্যে ফুটছিলো ভট্‌ ভট্‌ করে। পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি তখনো। ভালো করে সিদ্ধ করতে আরো কিছু জ্বালানি কাঠের দরকার তখন। কিন্তু তক্ষুণি কোথায় পাবে কাঠ? ঝুন্‌ঝুনি ঠুন্‌ঠুনিকে বললো—

—ওই পেরেকের সাথে ঝুলন্ত পুতুলটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। পুতুলটা খুব শুকনো কাঠের তৈরী বলেই মনে হচ্ছে। আগুনে দিলে বেশ ভালোই জ্বলবে। এখন ছাগলটা সিদ্ধ করার পক্ষে সুবিধে হবে।

তবুও ঝুন্‌ঝুনি আর ঠুন্‌ঠুনি দুজনেই ইতস্তত করছিলো প্রথমে। কিন্তু ওদের মালিকের সাংঘাতিক দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হোল না। ইচ্ছে না থাকলেও পুতুলকে সোজা বাবুর্চিখানায় নিয়ে এলো।

ভণ্ডুলের তো তখন অবস্থা খুবই কাহিল। বিপদ দেখে সে ডাংগার মাছের মতোই দাপাদাপি আর ছটফট্‌ করছিলো। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো সে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলো—

—বাবারে আমার, আমাকে বাঁচান! আমি মরতে চাই না। আমি মরতে চাই না।



॥ এগারো ॥

মাস্টার ইয়াংকি হেঁচে ফেলে ভণ্ডুলকে ক্ষমা করেন। ভণ্ডুল তার বন্ধু ঝুনঝুনিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।

খেলোয়াড় সাহেবের নাম মাস্টার ইয়াংকি। দেখতে সত্যি সত্যিই খুব ভয়ংকর। বিশেষ করে বুক, পেট ও পা ঢেকে যাওয়া কাপড়ের মতো লম্বা দাঁড়ি।

আসলে কিন্তু লোকটা তেমন খারাপ নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেলো তক্ষুণি। ভণ্ডুলকে যখন তাঁর সামনে নিয়ে আসা হোল।

তখন কাঁদছিলো ভণ্ডুল। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বলছিলো—আমি মরতে চাই না, মরতে চাই না। ভণ্ডুলের এই কাকুতি-মিনতিতে লোকটার প্রাণে দয়া ও মমতা জেগে উঠলো। শক্ত হয়ে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না। একবার হেঁচে উঠলেন।

হাঁচি শুনে ঝুন্‌ঝুনির কি আনন্দ! লজ্জাবতীর মতো লতিয়ে পড়লো সে। মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ভণ্ডুলের কানে কানে চুপি চুপি বললো—

— ভাই, সুসংবাদ। খেলোয়াড় হাঁচি দিয়েছেন। মানে কি জানো? তোমার উপরে তাঁর একটা মায়া জন্মে গেছে। তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে।

রহস্যটা না বলে পারছি না তোমাদেরকে। যদি কেউ কোনো অপরাধ করে মাস্টার ইয়াংকির কাছে এসে ক্ষমা চায়; কেঁদে কেটে একাকার করে চোখের পানি ঝরায়; তাহলে সত্যি হোক আর মিথ্যাই হোক মাস্টার ইয়াংকির আপত্তি নেই তাতে। মায়াদৃষ্টি পড়ে যাবেই তার উপরে। চোখের পানি নিজ হাতে মুছে ফেলে তক্ষুণি তিনি হাঁচি দেবেন। হাঁচিতে তিনি বুঝাতে চাইতেন – তাঁর হৃদয়ে অনেক দয়া।

সেই হাঁচির পরেই খেলোয়াড় রুক্ষ গলায় ভণ্ডুলের দিকে তাকিয়ে বললো—

—কাঁদিস না। তোর চোখের পানি আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধছে। আমি আর সইতে পারছি না। বলেই আবার দু'বার হাঁচলেন তিনি—হ্যাচ্‌-চ, হ্যাচ্‌-চ।

ভণ্ডুল তখন খুশি হয়ে বললো—

—আপনার মংগল হোক।

—ধন্যবাদ! মাস্টার ইয়াংকি বললেন। তোমার বাপ-মা কি এখনো জীবিত?

—আমার বাবা আছেন। কিন্তু মাকে কোনোদিনই দেখিনি আমি।

—ভাগ্যিস, তোমাকে আগুনে ফেলে দিইনি! তোমার বাবা জানতে পারলে না জানি কতো দুঃখ করতেন তিনি। তিনি এখন বুড়ো হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। আহা বেচারা বুড়ো মানুষটার জন্যে আমার ভীষণ মায়া লাগছে। হ্যাঁচ্-চ, হ্যাঁচ্-চ, হ্যাঁচ্-চ। আবার তিনবার হাঁচলেন তিনি।

—আপনার মংগল হোক। ভণ্ডুল আবার বললো।

—ধন্যবাদ! কিন্তু অসুবিধাটাও তো দেখতে হবে। ছাগল সিদ্ধ করবার মতো আমার কাছে কোনো কাঠ নেই এখন। তুমি হলে অবশ্য আমার খুবই সুবিধা হোত। কিন্তু কি করবো —আমার মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছো তুমি। তাই তোমাকে ছেড়ে দিতে হোল। যা হোক, তোমার বদলে আমার দলের অন্য পুতুলকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এই পুলিশ!



আদেশ পেয়ে তক্ষুণি দু'জন কাঠের পুতুল এসে হাজির। পাতলা গড়ন। বেশ লম্বা-চওড়া তারা। তাদের মাথায় লণ্ঠনের মতো এক ধরনের টুপি। হাতে তরবারি।

খেলোয়াড় তাঁর মোটা গলায় হুকুম দিলেন—

—ঝুনঝুনিকে ধরে বেঁধে আগুনে ফেলে দাও। আমার ছাগলটাকে ভালো করে সিদ্ধ করা চাই।

তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারো—বেচারা ঝুনঝুনির অবস্থাটা তখন কি! ভীষণ ভয় পেয়ে পা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলো।

খেলোয়াড়ের সিদ্ধান্তের কথা শুনে ভণ্ডুলও দারুণ দুঃখ অনুভব করলো। সে মাস্টার ইয়াংকির পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিলো তাঁর লম্বা দাড়ি। বহু অনুরোধ জানালো।

—মাস্টার ইয়াংকি সাহেব, দয়া করুন।

—এখানে কোনো সাহেব নেই। খেলোয়াড় বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন।

—দয়া করুন হুজুর।

—এখানে কোনো হুজুর নেই।

—দয়া করুন বাবু।

—এখানে কোনো বাবু নেই।

—দয়া করুন উজীরে আলা।

খেলোয়াড় যখন শুনতে পেলেন তাঁকে উজীরে আলা সম্বোধন করা হয়েছে তখন একটু নরম হলেন তিনি। নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে হোল নিজের কাছেই। মনুষ্যত্বে আঘাত লাগলো দারুণ। ভণ্ডুলকে বললেন—

—কি চাও তুমি?

—বেচারা ঝুনঝুনির মুক্তি চাই।

—না। কিছুতেই তা হতে পারে না।

—একটু দয়া করুন।

—তোমাকে বাঁচাতে হলে তাকে আগুনে ফেলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। ভালোভাবে আমার ছাগলটা সিদ্ধ করতে চাই।

—যদি তাই হয়—

বলে সোজা দাঁড়িয়ে তার রুটির টুপি ফেলে দিয়ে গর্জে উঠলো ভণ্ডুল।

—যদি তাই হয় তবে এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না।

আমার কর্তব্য আমিই বেছে নিচ্ছি। পুলিশ সাহেবরা চলুন, আমাকে বেঁধে সেই আগুনে ফেলে দিন। বেচারা ঝুন্‌ঝুনি আমার প্রকৃত বন্ধু। আমার জন্যে তাকে মরণ বরণ করা ঠিক হবে না।

মহাপুরুষদের মতো উচ্চারিত এই কথাগুলো ভণ্ডুলের মুখে শুনে উপস্থিত পুতুলদের সবাই কান্না জুড়ে দিলো। হাজার হোক তারাও তো কাঠের পুতুল!

মাস্টার ইয়াংকি শুরুতে বরফের মতো পাষাণ হয়ে জমে ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাঁর চোখ থেকে পানি গড়াতে দেখা গেলো। আর হাঁচতে শুরু করে দিলেন আগের মতো। চার পাঁচটি হাঁচি দেবার পরে স্নেহের বাহু দু'টি ভণ্ডুলের দিকে এগিয়ে বললেন,

—তুমি বড় ভালোছেলে। কাছে এসো। একটা চুমু দাও আমাকে।

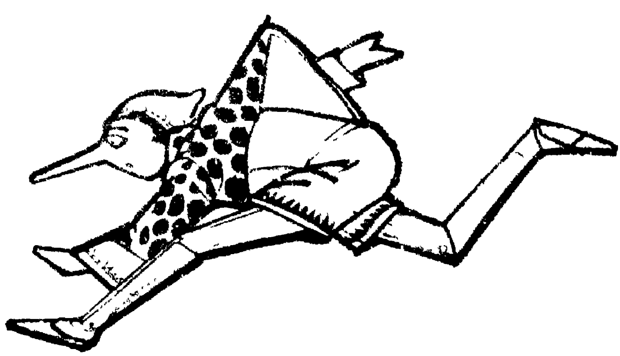
তক্ষুণি এগিয়ে গেলো ভণ্ডুল। কাঠবিড়ালীর মতো দাড়ির উপর বসে খুব ভালো করে একটা চুমু খেলো মাস্টার ইয়াংকির নাকের ডগায়।

—তাহলে মুক্তি পেয়েছি? বেচারা ঝুন্‌ঝুনি জিজ্ঞেস করলো ভীত গলায়।

—হ্যাঁ, তুমি মুক্ত। মাস্টার ইয়াংকি জবাব দিলেন এবং পরক্ষণেই শ্বাস টেনে মাথা নেড়ে বললেন—

—যাই হোক, আজ রাতে না হয় আধাসিদ্ধ ছাগলই খাবো। পরে যার পালা হয় দেখা যাবে।

এই মুক্তির খবর না পেয়ে পুতুলরা সবাই জমায়েত হলো এক জায়গায়। বাতি জ্বেলে মঞ্চটাকে একটু গোছগাছ করে নিলো। তারপর তাদের আনন্দ দেখে কে। কেউ লাফালাফি, কেউ বা নাচতে শুরু করে দিলো। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেলো। তবুও তাদের নাচন থামলো না।



॥ বারো ॥

খেলোয়াড় মাস্টার ইয়াংকি পাঁচটি সোনার মোহর ভণ্ডুলের হাতে দিয়ে তা তার বাবা বাটুল মিয়াকে পৌঁছিয়ে দিতে বলেন। পথে নেকড়ে বাঘ ও বিড়ালের ফাঁদে পড়ে তাদের কথা মতো কুক পাখীর দেশে যায়।



পরদিন মাস্টার ইয়াংকি ভণ্ডুলকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—

—তোমার বাবার নাম কি ?

—বাটুল মিয়া।

—কি কাজ করেন ?

—গরীব।

—কত আয় করেন ?

—ধরুন, এতো আয় তিনি করেন যে পকেটে এক পয়সাও থাকে না। আমি একটু খুলে বললেই আপনার পক্ষে অনুমান করতে সহজ হবে। আমার বর্ণমালা কিনতে গিয়ে তিনি নিজের কোটটাই বিক্রি করে দিলেন। অথচ কোটটা ছিলো ছেঁড়া আর তালিতে জর্জরিত।

—বেচারা! আহা তার জন্যে মায়া লাগছে আমার। নাও এই পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা। তাকে দিয়ে আমার সালাম জানিও।

এ কথা না বললেও চলে। ভণ্ডুল তখন সেই খেলোয়াড়কে হাজার হাজার ধন্যবাদ জানালো। দলের সমস্ত পুতুলের সাথে একে একে কোলাকুলি করলো। এমন কি পুলিশেরা পর্যন্ত বাদ গেলো না। সেদিন আনন্দে ভরপুর হয়ে ভণ্ডুল বাড়ীর দিকে রওনা করলো। কিন্তু আধা মাইল যেতে না যেতেই দেখা হয়ে গেলো একটা খোঁড়া নেকড়ে বাঘ ও একটা অন্ধ বিড়ালের সাথে। ওরা প্রকৃত বন্ধুর মতো একে

অপরের সাহায্য নিয়ে চলছিলো। খোঁড়া নেকড়েটা হাঁটছিলো বিড়ালের কাঁধে ভর করে। আর অন্ধ বিড়ালটি হাঁটছিলো নেকড়ের উপর নির্ভর করে।

—সালাম ভণ্ডুল সাহেব। নেকড়ে সসম্মানে এবং মিষ্টি গলায় বললো।

—আমার নাম জানলেন কেমন করে? পুতুল জানতে চাইলো।

—তোমার বাবাকে ভালভাবেই চিনি।

—তাই নাকি! কোথায় দেখলেন তাকে?

—এই তো গতকালের কথা, তার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম।

—কি করছিলেন?

—কিছু না। তার গায়ে কোনো কোট ছিলো না। তাই শীতে কাঁপছিলেন।

—বেচারা বাবা! কিন্তু আল্লার ইচ্ছা থাকলে আজ থেকে আর কাঁপতে হবে না।

—কেনো?

—আমি মস্তবড় ধনী হয়ে গেছি।

—বলো কি! তুমি মস্তবড় ধনী হয়েছো? নেকড়ে বাঘ বললো। আর হাসাহাসি করে ঠাট্টা তামাসা করতে লাগলো।

বিড়ালও যোগ দিলো সেই হাসিতে। কিন্তু যাতে করে ভণ্ডুল টের না পায় সে জন্যে নিজের পায়েই মোঁচটাকে ঢেকে রেখেছিলো নিজে।

—হাসাহাসির কোনো কারণ তো দেখছি না! ভণ্ডুল বিরক্ত হয়েই বললো। তোমাদের মুখে লালা আসতে পারে সে জন্যে দুঃখিত আমি। এই যে টাকা পাঁচটা দেখছো না—এর সবকটাই এক একটা সোনার মোহর।—এই বলে সে মাস্টার ইয়াংকির দেওয়া সেই সোনার মোহরগুলি বের করে দেখালো।

সেই সুন্দর মোহরের ঝন্-ঝন্ শব্দে অনিচ্ছাকৃতভাবে নেকড়ে বাঘের পা দুটো এগিয়ে এলো। আর বিড়ালের দুটি চোখই খুলে গেলো দুটো সবুজ হ্যারিকেনের মতো। পরক্ষণেই আবার চোখ বন্ধ করে দিলো। ভণ্ডুল কিন্তু টের পেলো না কিছুই।

নেকড়ে বাঘ বললো—

—এখন এই টাকা দিয়ে কি করবে তুমি?

পুতুল উত্তর দিতে গিয়ে বললো—
—আমার বাবার জন্যে সুন্দর দেখে একটা নতুন কোট কিনতে চাই। কোটটা কেমন হবে জানেন? সোনা অথবা রূপো দিয়ে তৈরী। বোতামগুলো থাকবে খুবই চক্‌চকে। এছাড়া, আমার নিজের জন্যে একটা বর্ণমালাও কিনতে হবে।
—তোমার জন্যে?
—হ্যাঁ, আমি ইস্‌কুলে যেতে চাই। পড়াশুনা করে ভালো হতে চাই।
এবারে নেকড়ে বললো-
— আমাকে দেখো। পড়াশুনা করতে গিয়েই আমার পা হারিয়েছি।
বিড়াল বললো—
—আমাকে দেখো। পড়াশুনার পাগলামি করতে গিয়ে আমার দুটো চোখই হারিয়েছি।
ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সাদা কোকিল রাস্তার পাশের গাছ থেকে ডেকে উঠলো—
—ভণ্ডুল, অসাধু বন্ধুদের পরামর্শ শুনো না। তাহলে তোমাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে।
আহা, বেচারা কোকিল যদি তখন ওকথা না বলতো তবে তার অমন দুর্দশা হোত না। বিড়াল একটা লম্বা লাফ দিয়ে ধরে ফেললো কোকিলটাকে। আর একেবারে এক ঢোকেই গিলে ফেললো। হতভাগ্য কোকিল 'হায় হায়' বলতেও সময় পেলো না। এ দিকে বিড়াল খেয়ে দেয়ে মুখটাকে মুছে চোখ বন্ধ করে দিলো। আবার আগের মতোই অন্ধ হয়ে গেলো সে।
—আহ্, বেচারা কোকিল। ভণ্ডুল বিড়ালকে বললো। কেনো ওর সংগে অমন দুর্ব্যবহার করতে গেলে!
—একটা সমুচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছি। অপরের আলোচনার মধ্যে আর কোনোদিন হাত দিতে আসবে না।
এমনি অনেক কথাবার্তা বলতে বলতে পাশাপাশি হেঁটে চলছিলো ওরা। হঠাৎ নেকড়ে পুতুলকে উদ্দেশ্য করে বললো -
—তুমি কি টাকাগুলো দ্বিগুণ করতে চাও?
—মানে?

—তুমি কি চাও তোমার সামান্য পাঁচটা সোনার মোহর থেকে একশ'ত এক হাজার, দু'হাজার, অথবা তার চেয়েও বেশী পেতে ?

—সত্যি নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তা কেমন ক



—কাজটা খুবই সহজ। ঘরে না ফিরে আমাদের সংগে যেতে হবে তোমাকে।

—কোথায় নিয়ে যাবে ?

—কুক পাখীর দেশে।

ভণ্ডুল প্রথমে কি যেন চিন্তা রলো খানিক। তারপর সোজাসুজি বললো—

—না আমি যেতে চাই না। কাছেই আমার বাড়ী। বাড়ী ফিরে যাবো এখন। সেখানে বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বেচারা বুড়ো মানুষ! কি জানি আমাকে না দেখে কতো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। সত্যিই আমি খুব দুষ্টু হয়ে গেছি। ঝিঁ-ঝি পোকা সত্যি কথাই বলেছিলো—অবাধ

ছেলেদের এ জগতে ভালো হতে পারে না কিছুতেই। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারই প্রমাণ পেয়েছি আমি। এ যাবত অনেক বিপদ আপদ ঘটে গেছে আমার উপর দিয়ে। কাল রাতেও মাস্টার ইয়াংকির বাড়ীতে বসে কি বিপদই না হোল। উহ্, সে সব ভাবতে গেলে শরীর শিউরে ওঠে এখনো।

নেকড়ে বাঘ জানতে চাইলো—

—তা হলে তুমি বাড়ীতেই যেতে চাও? চলে যাও। ক্ষতি হবে কিন্তু তোমারই।

—তোমারই ক্ষতি হবে। বিড়াল বললো।

—ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখো ভণ্ডুল। ভাগ্যকে লাথি মেরে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—ভাগ্যকে লাথি মেরে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। বিড়াল আবার সায় দিলো।

—তোমার পাঁচটা মোহর আজ থেকে কালকের মধ্যে দু'হাজার পর্যন্তও হতে পারে।

—দু'হাজার হতে পারে। বিড়াল এবারেও সায় দিলো নেকড়ের কথায়। ভণ্ডুল বোকার মতো আশ্চর্য হয়ে শুনছিলো সব। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করলো—

—কি করে হবে অতোগুলো মোহর?

নেকড়ে বললো—

—বেশতো এক্ষুণি বলছি। সেই কুক পাখীর দেশে একটা মস্তবড় ক্ষেত আছে। সবাই তাকে আশ্চর্যের ক্ষেত বলে থাকে। তোমাকে সেখানে গিয়ে একটা ছোট গর্ত করে মোহরগুলি মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। তারপর তার উপরে দু'তিন বালতি কলের পানি ঢেলে দেবে। আর কোনো চিন্তা নেই। শুধু সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিয়ে রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকো। রাতের মধ্যেই সেই টাকায় অংকুর গজাবে। ফুল হবে। আর সকালে সূর্য ওঠার সংগে সংগে সেখানে গিয়ে কি দেখতে পাবে জানো? দেখবে, একটা চমৎকার গাছ। অনেক অনেক সোনার মোহর ফলে রয়েছে তাতে। যেমন করে ফসলের দিনে ধানের শীষে ধান ফলে।

ওদের নরম কথায় ধীরে ধীরে পটে গেলো ভণ্ডুল। লোভ সামলাতে পারলো না। বললো,

—তাহলে এই পাঁচটা মোহরই যদি সেই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতে রাখি তবে পরদিন কতোগুলো পেতে পারি ?

নেকড়ে বাঘ এবারে সুযোগ বুঝে জবাব দিলো—

—হিসেব করা খুবই সহজ। এ হিসেব আংগুলের কর গোনেই করা যাবে। মনে করো, প্রত্যেকটি মোহরের বদলে একবাক্স করে পাওয়া যাবে। তুমি পাঁচকে পাঁচশ' গুণ করো তাতে হবে—তাতে হবে দু'হাজার পাঁচশ' চমৎকার সোনার মোহর।

ভণ্ডুল আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

—কি চমৎকার জিনিস ! যখন আমি সেই দু'হাজার পাঁচ শ' সোনার মোহর পাবো—আমার জন্যে দু'হাজার রেখে বাকী পাঁচ শ' আপনা-দেরকে দেবো।

নেকড়ে বাঘ যেন খুবই অপমান বোধ করলো এতে। সে বললো,

—আমাদের জন্যে উপহার ? না, খোদা যেন তা না করেন।

বিড়াল বললো—

—খোদা যেন তা না করেন।

নেকড়ে বাঘ আবার বললো—

—আমরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করি। পরিশ্রম করি শুধু পরকে ধনী করবার জন্যে।

বিড়াল তার অভ্যাসজনিত সায় দিয়ে বললো—

—পরকে ধনী করবার জন্যে।

—কি সুন্দর দেশ ! ভণ্ডুল মনে মনে বিচার করে বললো। বাড়ীতে তার বাবা, আর তার নতুন কোটের স্বপ্ন; নিজের জন্যে বর্ণমালা প্রভৃতি সব কিছু ভুলে গিয়ে নেকড়ে বাঘ এবং বিড়ালকে বললো—

—চলুন যাই। আমি আপনাদের সংগে যাবো।

॥ তেরো ॥

লাল চিংড়ি মাছের দোকান।

ওরা চলছে। চলছে। চলছে।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাসন্ধ্যি পৌঁছালো গিয়ে লাল চিংড়ি মাছের খাবারের দোকানটায়।

নেকড়ে বাঘ বললো—

—এখানে একটু বসি। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সামান্য কিছু খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম যাই। ভোর রাতের দিকে আবার রওনা করে কাল বেলা ওঠার আগেই 'আশ্চর্য ক্ষেতে' পৌঁছে যাবো।

খাবারের দোকানে ঢুকে ওরা তিনজন বসলো পাশাপাশি এক টেবিলে। কিন্তু মজার ব্যাপার, ওদের মধ্যে কারুর পেটেই খিদে ছিলো না। তবুও ওরা খেতে বসলো।

বেচারা বিড়াল পেটের ব্যথায় তেমন কিছু খেতে পারলো না। শুধু গোটা চল্লিশেক টমেটো আর থালা চারেক মাংস খেলো। মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়েছিলো না বলে তিন থালা ভাত এবং তার সংগে কিছু তরকারি চেয়ে খেয়েছে।

নেকড়ে বাঘ খেতে চেয়েছিলো সাধ মিটিয়ে। কিন্তু ডাক্তারের কড়া নিষেধ ছিলো বলেই তা সম্ভব হোল না। সে কেবল একটা খরগোশ, কয়েকটা মুরগী ও মোরগ খেলো। তাছাড়া, কিছুটা পাখীর মাংস, হাঁসের মাংস, ব্যাঙের মাংস, টিকটিকির মাংস, কিছু আংগুর ফল প্রভৃতি চেয়ে নিয়ে খেলো। আর বিশেষ কিছু চাইলো না। তবে বলেছিলো—শরীর খুবই খারাপ। খাবার টাবার কিছুই নাকি মুখে দিতে ইচ্ছে হয় না।

সবচেয়ে কম খেলো ভণ্ডুল। সামান্য একটু সুপারি আর সামান্য এক টুকরো রুটি মাত্র। বাকীটা সব থালায়ই পড়ে রইলো।

এখন ভণ্ডুলের চিন্তা শুধু আশ্চর্য ক্ষেত নিয়ে। তার কল্পিত টাকাগুলো যেন পেটের মধ্যেই ছিলো। হজম হচ্ছিলো না মোটে।

খাওয়ার পর্ব শেষ হোল। নেকড়ে বাঘ সেই দোকানীকে বললো—

—ভালো দেখে দুটো ঘর দিয়ে দিন। ভণ্ডুল সাহেবের জন্যে একটা,





আর অপরটা আমার এবং আমার বন্ধুর জন্যে। চলে যাবার আগে একটু ঘুমাতে চাই। ও ভালো কথা, মাঝরাতে কিন্তু আমাদেরকে জাগিয়ে দিতে হবে। তখন রওনা করবো আমরা। সাবধান—মনে থাকে যেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, থাকবে। দোকানী উত্তর দিলো। আর নেকড়ে ও বিড়ালকে চোখ টিপে জানালো—হ্যাঁ, সব বুঝেছি।



ভণ্ডুল শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে গেলো। অজস্র স্বপ্ন দেখতে লাগলো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। নানান রঙের নানান কল্পনা এসে ভিড় জমালো। সে যেন একটা ক্ষেতের মধ্যে রয়েছে। আশ্চর্য ক্ষেত সেটা। সেখানে আছে ছোট ছোট গাছ। অনেক ডালপালা রয়েছে তাতে। আর অজস্র সোনার মোহরে ভর্তি সেগুলো। বাতাসে সব দুলছে ঝুন্-ঝুন্-ঝুন-ঝুন শব্দ করে। তারা যেন ভণ্ডুলকে ডেকে বলছে—আমাদেরকে নিয়ে যাও।

একটা শুভক্ষণ দেখে ভণ্ডুল যখন হাত পাতলো—সেই মোহরগুলোয় মুহূর্তেই দু'টো হাতই ভর্তি হয়ে গেলো। তারপর যখন সেগুলো পকেটে ভরতে যাবে ঠিক সেই সময় দরজায় তিনটি আঘাতের শব্দে জেগে গেলো সে।

এদিকে দোকানী এসেছে তার কথামতো মাঝরাতে। এসে দেখলো ভণ্ডুল জেগে। সে দোকানীকে জিজ্ঞেস করলো—

—আমার বন্ধুরা কি প্রস্তুত?

—প্রস্তুত? দু'ঘণ্টা আগেই তো চলে গেছে তারা।

—অতো আগে কেনো?

—বিড়াল নাকি তার বড় ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়েছে। বেচারা নাকি মরবার মতো হয়েছে।

—ওরা খাবারের পয়সা দিয়ে গেছে তো?

—এসব কি বলছেন আপনি! ওরা অতিরিক্ত শিক্ষিত আর ভদ্র। আপনাকে কেনো অতোবড় অপমান করতে যাবে?

—এমন অপমান হলে আমি খুশিই হতাম বরং। ভণ্ডুল মাথা চুলকিয়ে বললো এবং পরক্ষণেই জানতে চাইলো—

—তারা আমার জন্যে কোথায় অপেক্ষা করবে সে সব বলে গেছে কিছু?

—কাল সকালে আশ্চর্য ক্ষেতে।

অগত্যা কি আর করবে ভণ্ডুল। তার এবং বন্ধুদের খাবারের দাম বাবদ একটা সোনার মোহর দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলো।

ভণ্ডুল চলেছে বন্ধুদের খুঁজতে। বাইরে ভীষণ অন্ধকার। কোনো পথই দৃষ্টিগোচর হয় না তখন। তবুও হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলেছে ভণ্ডুল।

বড্ড ভয় লাগছে ভণ্ডুলের। চারিদিকটাই নীরব নিঝুম। কোথাও সাড়া নেই কারো। আশপাশে গাছ-গাছালির পাতাগুলো পর্যন্ত নিস্তব্ধ। শুধু কয়েকটা রাতজাগা পাখী রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকে পাখা ঝাপটিয়ে ঘোরাফেরা করছে। একটা পাখীর ডানা এসে লাগলো ভণ্ডুলের নাকের ডগায়। ভণ্ডুল ভয়ের চোটে চট করে পিছনে সরে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো—

—কে, কে যাচ্ছে? সাথে সাথে আশপাশে ও দূরদূরান্তরে প্রতিধ্বনি



শোনা গেলো—কে, কে যাচ্ছে—কে যাচ্ছে—কে যাচ্ছে ?

যেতে যেতে একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো ভণ্ডুল। কি একটা প্রাণী দেখা গেলো ডালের উপর। মলিন চেহারা। অথচ জ্যোৎস্নার মতো জ্বলজ্বলে। হ্যারিকেনের দীপ্তি কাঁধের মধ্যে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে যেন।

—কে তুমি ? ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করলো তাকে।

—আমি ঝিঁ-ঝি পোকার কায়া। সেই প্রাণীটি উত্তর দিলো করুণ গলায়। আশ্চর্য সে কণ্ঠ ! যেন পরলোক থেকে ভেসে আসছে অনন্ত বেদনা নিয়ে।

পুতুল বললো—

—কি চাও এখানে ?

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।

—বলো কি তোমার পরামর্শ।

—তোমার কাছে এখন যে সোনার মোহরগুলো আছে সেগুলো নিয়ে বাড়ী যাও। তোমার বাবাকে দিয়ে দাও সব। অনেকদিন তোমাকে দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করছেন তিনি।

—দেখে নিও, কালকেই আমার বাবা এক বড় সাহেব বনে যাবেন।

—তা কেমন করে ?

—এই চারটে সোনার মোহর কাল দু'হাজার হয়ে যাবে।

—দেখো ভাই, যারা সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যেই তোমাকে ধনী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাদেরকে বিশ্বাস করো না কখনো। ওরা হয় পাগোল নতুবা প্রতারক। আমার কথা শোন। ফিরে যাও।

—কিন্তু আমি যে আমার গন্তব্যস্থলে এগিয়ে যেতে চাই।

—এখন আর সময় নেই। দেরী করে ফেলেছো অনেক।

—তবুও এগিয়ে যেতে চাই।

—রাস্তায় যে বিপদ!

—থাকুক। তবুও যেতে চাই আমি।

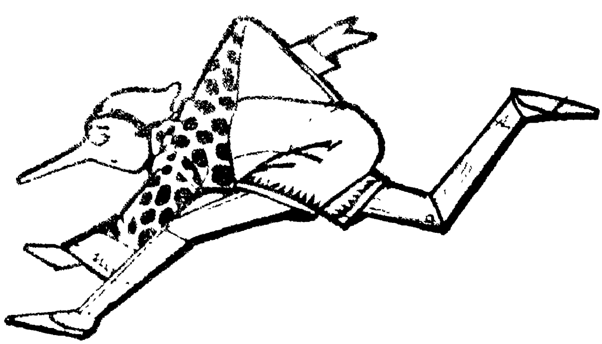
—মনে রেখো ভণ্ডুল -যে ছেলেরা এ ধরনের আব্দার করে, নিজের ইচ্ছে মতো চলতে চায় তাদের কপালে অনেক দুঃখ। তা এখনই হোক অথবা দু'দিন পরে।

—সব সময় কি সব কথা যে বলো তুমি! আচ্ছা ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ঝিঁ-ঝি পোকা।

—ধন্যবাদ ভণ্ডুল। রাতের ঠাণ্ডা আর ঘুম থেকে খোদা তোমাকে রক্ষা করুন।

এই শেষের কথাটা বলেই ঝিঁ-ঝি পোকা হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো। ফু' দিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়ার মতো তার দেহের জ্যোতিও নিভে গেলো সাথে সাথে।

পথ আগের চেয়েও অন্ধকার হয়ে গেলো।



॥ চৌদ্দ ॥

ভণ্ডুল ঝি-ঝি পোকার সাথে কথা কাটাকাটির পর ডাকাতের হাতে ধরা পড়ে।

পথ চলতে অনেক কিছুই ভাবছিলো পুতুল।

—সত্যিই কতো অসহায় আমরা। কতো দুর্ভাগ্য আমাদের। সবাই আমাদের গালিগালাজ করে। শিক্ষা দিতে চায়, উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। প্রশ্রয় পেয়ে আমাদের বাবা হতে চায়। আমাদের গুরু হতে চায় সবাই। সবাই। এমন কি ঝিঁ-ঝি পোকাও। দেখো কাণ্ড!

সে যাক্‌গে। আমি ওসব ঝিঁ-ঝি পোকাটোকার কথা শুনতে চাই না। কি জানি ওদের কথামতো কাজ করলে যদি কোনো বিপদ হয়ে বসে! কাজ নেই অতো দিয়ে। আমার যখন যা খুশি তা-ই করবো। ওদের তাতে কি! সবার সংগেই আমার পরিচয় থাকা দরকার। অসুবিধা বলে কিছু আছে তা আমি মনে করি না। গুণ্ডাদের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি না আমি। কোনোদিন বিশ্বাসও করবো না। আমার মনে হয় বাবাদের এসব ভয় দেখাবার করসাজি। ছেলেপিলেরা ভয় পেয়ে যাতে করে রাত-বিরাতে বাইরে না যায় তারই একটা বিহিত ব্যবস্থা। আচ্ছা এখন যদি ওরা এসে পড়ে? আসুক না ক্ষতি কি! আমাকে ভয় দেখাতে পারবে? স্বপ্নেও না। ভয় দেখাতে এলে আমিই বরং ওদের মুখের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতাম—দেখো বাপু, আমার সাথে ওসব খেল চলবে না। চুপচাপ সোজা পথ ধরে অগ্রসর হও। তখন? কথা শুনেই বন্ধুরা বাতাসের আগে ভেসে যেতো। নতুবা আমি নিজেই সরে পড়তাম। সব ব্যাপারটারই সমাধান হয়ে যেতো তাহলে।

এমনি আরো কি সব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চম্‌কে উঠলো ভণ্ডুল। ভয় পাবার কথাই। পিছন থেকে পাতার সামান্য মর্মর-ধ্বনি শুনতে পেলো সে। পিছন ফিরে ভালো করে তাকালো সেদিকে। দু'টি কালো মূর্তি দুটি কয়লার বস্তার মধ্যে জড়ানো দেখতে পেলো। অন্ধকারে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিলো ওদের। কি ভীষণ সে দৃশ্য বাবা! দেখতে দেখতে ওরা ভূতের মতো লাফালাফি শুরু করে দিলো। ঠক্‌-ঠক্‌ করে ওর পিছনে ঘুরতে লাগলো।

—এইতো ওরাই বুঝি। মনে মনে বললো ভণ্ডুল। আর কোথায় সেই সোনার টাকা চারটি লুকোবে বুঝতে না পেরে একেবারে মুখে অর্থাৎ ঠিক জিভের নীচে ঠেসে রাখলো। আর পালাতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু সম্ভব হোল না। পালাতে পারলো না। ওদের একজন এসে পিছন থেকে একটা হাত ধরে ফেললো ওর। আর দুটি মোটা কণ্ঠ এক সাথে বেজে উঠলো—



—হয় টাকার থলি নতুবা জীবন দাও।

মুখে শব্দ করলো না ভণ্ডুল। করবে কি করে? তার মুখে যে টাকা! কথা বললেই হয়তো ঝনাৎ করে পড়ে যাবে। তাই সে মুখ না খুলে দু'হাত তুলে হাজার হাজার সালাম জানাতে লাগলো। আর আভাসে-ইংগিতে অনুনয় বিনয় শুরু করে দিলো। অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলো—সে একটা অসহায় পুতুল। তার পকেটে জাল পয়সাও নেই।

গুণ্ডা দু'জন কিন্তু পুতুলের কথায় আমল দিলো না মোটেই। বস্তার ফাঁকে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিলো। অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ভণ্ডুলের হাবভাব বুঝতে পেরে ধমক দিয়ে বললো—

---যাও যাও মিয়া, বেশী কথার দরকার নেই। টাকাগুলো বের করে দাও বলছি।

পুতুল মাথা নেড়ে জানালো আবার। তার কোনো টাকা নেই। কিন্তু লম্বা গুণ্ডাটি শুনলো না তা। সে রেগে মেগে বললো –

—টাকা বের করে দাও। নতুবা মরে যাবে বলছি!

—নতুবা মরে যাবে বলছি। অপর গুণ্ডা বললো।

—তোমাকে তো খুন করবোই, তোমার বাবাকেও ছাড়বো না।

—তোমার বাবাকেও খুন করবো।

—না-না-না, আমার বেচারা বাবাকে নয়। ভণ্ডুল ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। চেঁচাতে গিয়ে তার মুখের ভিতরে রাখা সেই সোনার টাকাগুলো বেজে উঠলো।

ওরে বদমায়েশ! টাকাগুলো জিভের নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বুঝি। ফেলো, ফেলো বলছি! এক্ষুণি থুতু করে ফেলে দাও।

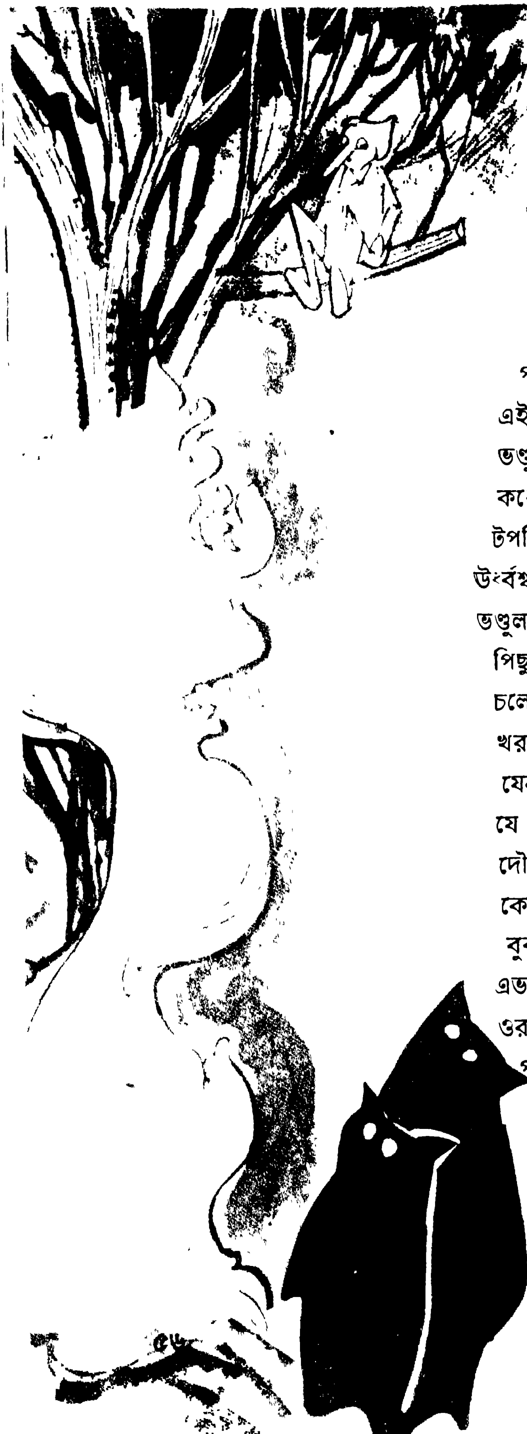
অবস্থা আঁচ করতে পেরে ভণ্ডুল একটু শক্ত হয়েই দাঁড়ালো।

—এই, শুনতে পাচ্ছো না? কালা হয়ে গেলে নাকি? দাঁড়াও আমরাই বের করে নিচ্ছি।

বলেই ওদের একজন পুতুলের নাক, অপর জন দাঁড়ি ধরে দুদিক থেকে দু'জনে টানাটানি শুরু করে দিলো। উদ্দেশ্য হোল যাতে করে পুতুল বাধ্য হয়ে মুখ খুলে দেয়।

কিন্তু কিছুতেই কাবু করতে পারলো না ওরা। পুতুল যেন একেবারে পেরেক দিয়ে এঁটে রেখেছে মুখ। আর সেই পেরেকের বিপরীত দিকটাও যেন ভাঁজ করে রাখা হয়েছে শক্ত করে।

অন্য কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিলো বেঁটে গুণ্ডাটা। বড় এক ছুরি বের করে পুতুলের মুখের মধ্যে ঢুকাতে চেষ্টা করলো ছেনির মতো করে। কিন্তু ভণ্ডুল বিদ্যুতের মতো গিয়ে দাঁত দিয়ে তার হাত দিলো কামড়ে। এয়ছা কামড়ই না দিলো যে এক কামড়েই হাতের কাজ শেষ। তারপর কাটা হাত-



টাকে থুতু করে মুখ থেকে মাটিতে ফেলে দিলো সে।

তোমরা ভেবে দেখো কতো আশ্চর্য হোল ভণ্ডুল যখন টের পেলো হাতের পরিবর্তে মাটিতে একটা বিড়ালের পা পড়েছে।

এই সর্বপ্রথম জয়ের আশ্বাস পেলো ভণ্ডুল। গুণ্ডাদের হাত থেকে জোর করে মুক্তি নিতে গিয়ে দেয়াল টপকিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো।

ভণ্ডুল দৌড়াচ্ছে। গুণ্ডারাও ছুটেছে পিছু পিছু। প্রাণপণে ধাওয়া করে চলেছে তারা। দুটো কুকুর একটা খরগোশকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে যেন।

যে গুণ্ডাটা পা হারিয়েছিলো সেও দৌড়াচ্ছে কিন্তু সমান তালে। কেমন করে যে পারছিলো তা বুঝা মুশকিল।

এভাবে প্রায় পনেরো মাইল দৌড়ালো ওরা। ভণ্ডুল অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন। আর দৌড়াতে পারছে না সে। নিজেকে হেরে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি একটা উঁচু গাছের মাথায় গিয়ে উঠে বসলো।

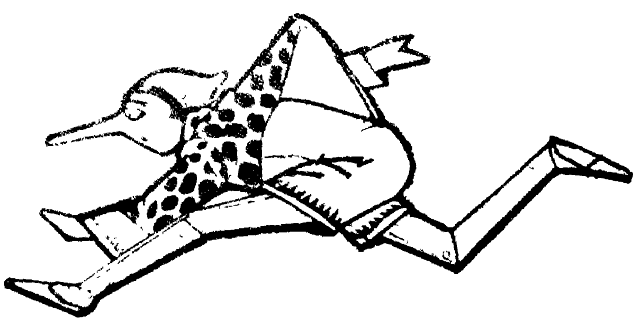
সেখানেও হামলা চালালো

গুণ্ডারা। চেষ্টা করতে লাগলো গাছে চড়তে। কিন্তু পারছিলো না। অর্ধেক উপরে ওঠে আবার পরক্ষণেই পড়ে যাচ্ছিলো মাটিতে। এভাবে উঠতে নামতে সারা গা-হাত-পা ছিলে গেলো তাদের।

ওরা হার মানলো না তবু। কয়েক টুকরো শুকনো কাঠ যোগাড় করে গাছের চারিদিকে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। মোমবাতির মতো জ্বলতে লাগলো গাছটা। ভণ্ডুল দেখলো মহাবিপদ। আগুনের শিখাগুলি ক্রমান্বয়েই উপরের দিকে উঠছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো সে। তবুও নিজেকে পাখীর মতো সিদ্ধ হয়ে মরতে দিতে চাইলো না সে। চমৎকার এক লাফ মেরে গাছ থেকে মাটিতে পড়েই আবার ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দে দৌড়।

এদিকে গুণ্ডারাও আবার আগের মতোই পিছু ধরলো। ক্লান্তি বলতে ওদের কিছুই ছিলো না যেন।

ইতিমধ্যে পূব দিকটা ফর্সা হয়ে উঠলো।





দৌড়াদৌড়ির পালা শেষ হয়নি তখনো। পালাচ্ছে পালাচ্ছে—হঠাৎ একটা চওড়া ও গভীর খালের সম্মুখীন হোল ভণ্ডুল। নোংরা পানি ভরা খালটা। কফির রঙের মতো তার পানির রঙ। এখন উপায়? এক-দুই-তিন বলে ভণ্ডুল দিলো এক লাফ। এক লাফেই ওপারে গিয়ে উঠলো সে।

তাই না দেখে গুণ্ডারাও দিলো লাফ। কিন্তু না পেরে একেবারে সেই খালের দুর্গন্ধময় পানির ভিতরে ঝপাৎ করে পড়ে গেলো। আহা তখন কি দুর্গতি বেচারাদের!

ভণ্ডুলের কানেও ভেসে এলো ওদের পড়ে যাওয়ার ঝপাৎ শব্দ। সে দৌড়াতে দৌড়াতে খুশিতে চিৎকার করে বলতে লাগলো—

—ভালো করে গোসলটা সেরে ওঠো গুণ্ডা সাহেবরা।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ওদের দেখা গেলো না। ভণ্ডুল ভাবলো হয়তো পানিতে ডুবেই মরে গেছে ওরা। কিন্তু হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে আবার দেখতে পেলো ওদের। দুজনেই ধেয়ে আসছে পিছু পিছু।

আশ্চর্য! তখনো ওরা বস্তার মধ্যে জড়ানো। ওদের গা থেকে টপ্-টপ্ করে পানি ঝরে পড়ছে।

।। পনেরো ।।

গুণ্ডারা ভণ্ডুলের পিছু পিছু ধায়। অবশেষে পুতুলকে ধরে ফেলে। এবং বড় একটা আমগাছের সাথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়।

অবশেষে আর না পেরে হার মানতে চাইলো পুতুল। ক্লান্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে তার। সে আড়চোখে তাকালো এদিক সেদিক। দূরে ঘন সবুজের মধ্যে বরফের মতো সাদা একটা ঘর দেখতে পেলো। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো ঘরটা। মনে মনে ভাবলো।

—কোনো রকমে ওখানটা পর্যন্ত পৌছুতে পারলেই বেঁচে যেতাম। ওদের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটা পথ করে নিতে পারতাম হয়তো। কোনোদিক লক্ষ্য না করে ভণ্ডুল ঘন জংগলের ভিতর দিয়ে সেদিকে দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। পিছনে পিছনে গুণ্ডারাও ছুটছে আগের চেয়ে আরো জোরে।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক এভাবে ছুটাছুটি। অবশেষে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সেই ছোট ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো ভণ্ডুল। কড়া নাড়লো। কিন্তু সাড়া দিলো না কেউ।

আবার কড়া নাড়া হোল। জোরে—আরো জোরে।

সর্বনাশ! এদিকে অনুসরণকারীদের পায়ের শব্দ একেবারে কাছে এসে গেছে যে! তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস তীরের মতো কানে বিঁধছে। এখন উপায়? কেউ নেই নাকি এখানে!

কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে অধৈর্য হয়ে উঠলো ভণ্ডুল। বেপরোয়া হয়ে লাথির পরে লাথি মারতে লাগলো দরজায়। আরো জোরে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলো। একটু পরেই এক অপূর্ব সুন্দরী নারীকে দেখতে পেলো সে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে তার দিকে তাকিয়েছিলো। তার মাথার চুল নীল। মুখমণ্ডল সাদা—অনেকটা মোমের পুতুলের মতো। চোখ বন্ধ। হাত বুকের উপর ক্রশের মতো করে আড়াআড়ি রাখা। যেন আর জগতের মানুষ সে। ঠোঁট না নাড়িয়েই মৃদু গলায় বললো—

—কেউ নেই ঘরে। সবাই মারা গেছে।

—আপনিই না হয় দরজাটা খুলে দিন। ভণ্ডুল বললো কেঁদে কেটে আর বহু অনুনয় বিনয় করে।

—আমিও মারা গেছি।

—মরে গেছেন ? তাহলে ওই জানালার সামনে কেনো ?

—একটা বাক্সের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। বাটাই নিয়ে যাস্রেব আমাকে। এই কথাগুলো বলতে না বলতেই কোথায় উধাও হয়ে গেলো সেই মেয়েটা। জানালাটা বন্ধ হয়ে গেলো একেবারে বিনা শব্দে। ভণ্ডুল চিৎকার করে উঠলো –

—চলে যাবেন না নীলকেশী সুন্দরী! দয়া করে দরজাটা খুলে দিন। এই অসহায় ছেলেটির প্রতি দয়া করুন। আমার পিছনে পিছনে গুন্...... কথাটা বলে শেষ করতে পারলো না ভণ্ডুল। পিছন থেকে দুটো হাত এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ভয়ংকর মোটা স্বরে বলে উঠলো—

—এখন আর পালাতে পারবে না।

খানিক আগেই চোখের সামনে মৃত নীলকেশীকে দেখেছে। তাই ভয় পেয়ে ভীষণভাবে কাঁপছে পুতুল। পা কেঁপে কেঁপে জোড়ায় জোড়ায় রীতিমতো ঠক্ ঠক্ শব্দ শুরু হয়ে গেছে। আর জিভের নীচে রাখা সেই টাকা চারটিও বাজতে আরম্ভ করেছে। গুণ্ডারা বললো—

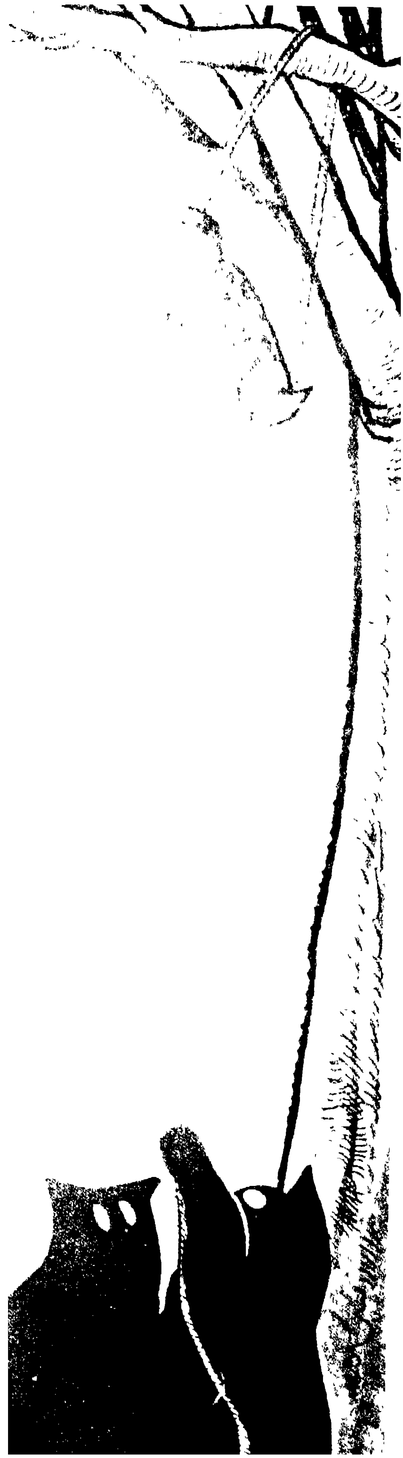
—তাহলে মুখ খুলবে না ? জবাব দেবে না ? আচ্ছা এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করছি। দেখি মুখ না খুলে কি করে পারো!

তারপর সেই লম্বা ছুরিটা বের করে এনে সামনা সামনি দাঁড়ালো। ক্ষুরের মতোই ধার ছিলো ছুরিগুলোয়। সজোরে পিছন থেকে কোমরে বসিয়ে দিলো। ভাগ্যিস, পুতুলটা ছিলো খুব শক্ত কাঠের তৈরী। তাই ছুরিটাই ভেঙে গেলো টুকরো টুকরো হয়ে। ভণ্ডুলের হোল না কিছুই। এই না দেখে সেই গুণ্ডারা হতভম্বের মতো শুধু ছুরির বাট হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলো। উভয়েই আশ্চর্য হয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখে তাকালো। একজন বললো—

—বুঝেছি। তোমাকে ফাঁসিতে না চড়ালে হবে না।

—তোমাকে ফাঁসিতে না চড়ালে হবে না। অপরজন বলে উঠলো। অতঃপর তারা জোর জবরদস্তি করে পুতুলকে পিঠমোড়া করে

বাধলো। গলায় ফাঁসির দড়ি লাগিয়ে পাশের বড় আমগাছটার সাথে ঝুলিয়ে দিলো।
একটু পরেই তো ভণ্ডুলের জীবন হবে শেষ। টাকা পাবার আর কোনোই বাঁধা থাকবে না তখন। তাই ওরা পুতুলের শেষ নিশ্বাসের অপেক্ষায় গাছের উপরে রইলো।
এদিকে এক দুই করে পুরোপুরি তিনটে ঘণ্টা কেটে গেলো। কিন্তু পুতুলের মরার নাম নেই। তার চোখ খোলা। মুখ বন্ধ। শুধু পা দাপাচ্ছে অনবরত।
অপেক্ষা করে করে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ওরা। ভণ্ডুলের দিকে তাকিয়ে খানিক হাসাহাসি করে ঠাট্টার সুরে বললো —
—সালাম। কাল আবার দেখা হবে। কাল এসে যেন দেখি অন্তত ভদ্রতার খাতিরে হলেও মারা গেছো তুমি। আর তোমার মুখখানা ইয়া বড় হা অবস্থায় খোলা রয়েছে। আসি কেমন? বলেই চলে গেলো ওরা।
হঠাৎ করে দক্ষিণ দিক থেকে তীব্র বাতাস বইতে শুরু করে দিলো। সে কি বাতাস! রাগে শোঁ-শোঁ করে গজরাচ্ছে যেন। আর ঝুলন্ত বেচারা ভণ্ডুল ঘণ্টার জিভের মতো এদিক সেদিক দুলতে লাগলো।



এমনি নাগরদোলায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো ওর। ফাঁসির দড়ি ক্রমান্বয়ে চেপে গলাটা রুদ্ধ করে দিতে লাগলো। ধীরে ধীরে চোখে অন্ধকার নেমে এলো। মৃত্যু আসছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। তবুও বাঁচার একটা তীব্র আকাঙক্ষা জেগে উঠলো প্রাণে। এক্ষুণি হয়তো কেউ এসে ওকে উদ্ধার করে যাবে।

কিন্তু বিফল। সব বিফল। কেউ এলো না। কাউকে দেখাও গেলো না। কেউ নেই কোথাও।

বেচারা পুতুলের অবস্থা তখন কাহিল। বাবার কথা মনে পড়ে গেলো তার। কথা বলার শক্তিটুকুও যেন সেই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে সে। তোত্‌লা হয়ে গেছে। তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে কোনো রকমে উচ্চারণ করলো—

—বাবা আমার, এখন যদি তুমি থাকতে. ....

বাস্‌, আর কিছু বলতে পারলো না বেচারা। চোখ দুটো বুজে এলো। মুখ খুলে গেলো। একটু নড়ে চড়ে একেবারে সটান হয়ে পড়ে রইলো সেখানে।



॥ ষোল ॥

নীলকেশী এক সুন্দরী মেয়ে ভণ্ডুলকে ফাঁসির দড়ি থেকে উদ্ধার করে। নিজের ঘরে এনে সুন্দর বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে রাখে। তিনজন ডাক্তার ডেকে ভণ্ডুলকে দেখানো হয়। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তারেরা তাদের অভিমত প্রকাশ করেন।

বেচারা ভণ্ডুল যখন গুণ্ডাদের ফাঁসির দড়িতে বড় আমগাছটার ডালটায় ঝুলছিলো তখন সেই নীলকেশী সুন্দরী মেয়েটি আবার জানালায় এসে দাঁড়ালো। ভণ্ডুলকে ওই অবস্থায় দেখে তার ভারী করুণা হোল। সে তিনবার তালি বাজালো। তারপর তিনবার পদধ্বনি করে কি একটা সংকেত করলো। সংগে সংগে একটা পাখীর ডানার শব্দ শোনা গেলো। পাখীটা ছিলো একটা মোটা সোটা চিল। দ্রুতবেগে এসেই সেই জানালা-টায় এসে বসলো।

—কি আদেশ, সুন্দরী পরী? চিলটা মাথা নেড়ে সালাম জানিয়ে বললো।

এখন বুঝতেই পারছো এই নীলকেশী মেয়ে একটা ফুটফুটে পরী ছাড়া অন্য কেউ নয়। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এই জংগলে বসবাস করছে।

এবারে পরী চিলকে বললো--

—ওই যে পুতুলটা দেখছো আমগাছটায় ঝুলছে!

—হ্যাঁ, দেখেছি।

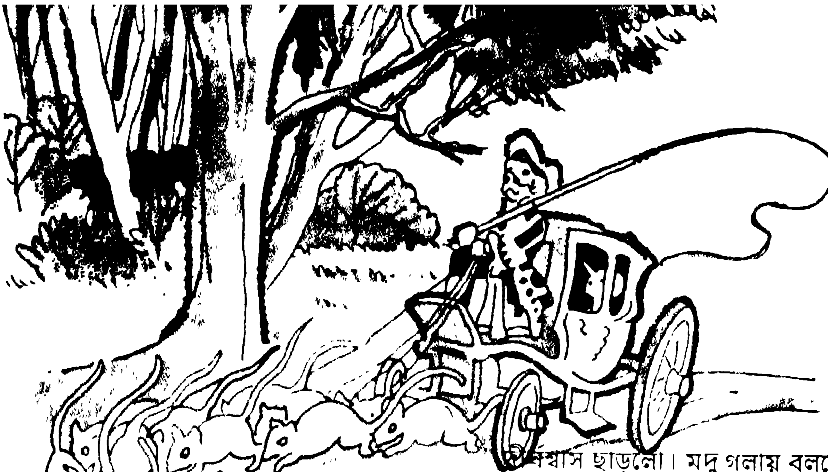
—বেশ। তাহলে এক্ষুণি উড়ে যাও ওখানে। তোমার মুখ দিয়ে ওর গলার দড়িটা কেটে দাও। আর বেশ যত্নের সাথে ঘাসের উপরে শুইয়ে রাখো। সাবধান, পুতুলের অসুবিধা হয় না যেন।

চিল আদেশ পেয়ে উড়ে গেলো। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এসে বললো—

—হুকুম মাফিক কাজ করে এলাম।

—কেমন দেখলে তাকে? জীবিত না মৃত?

—দেখে মনে হোলো মৃত। কিন্তু মরলেও একেবারে মরেছে বলে মনে হয় না। কারণ, যখন আমি দড়ি কেটে দিলাম ঠিক তক্ষুণি সে একটা





নিশ্বাস ছাড়লো। মৃদু গলায় বললো–
---এখন একটু ভালো লাগছে।

এই কথা শুনে পরী আবার দু'বার তালি বাজালো। আর অমনি চমৎকার এক কুকুর এসে হাজির। পিছনের দু'পায়ে হেঁটে এলো সে। ঠিক যেন একটা মানুষ।

কুকুরটির পরনে ছিলো ঘোড়-সওয়ারের পোশাক। মাথার টুপি-টায় ছিলো তিনটি শিং-এর মতো কি যেন। সোনা দিয়ে তৈরী ছিলো সেগুলো। মাথার চুল সাদা, কোঁকড়ানো। কাঁধের উপর দিয়ে লতিয়ে পড়েছিলো চুলগুলো। চক-লেট রঙের কোটটার বোতামগুলো ছিলো খুবই চকচকে। বড় বড় দুটি পকেট ছিলো তাতে। প্যাণ্টটা ছিলো একটু খাটো। পায়ে সিল্কের মোজা আর ছোট ছোট জুতা। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিলো তার পিছনের নীল কাপড়টা। বিশ্টির সময় লেজ ঢেকে রাখা হোত সেই কাপড়ে।

—চমৎকার জেম! পরী কুকুরকে বললো। যতো শীগ্‌গির পারো একটা সুন্দর ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে জংগলের ওদিকে ওই বড় আমগাছটার নীচে যাও। ওখানে একটা অসুস্থ পুতুলকে ঘাসের উপরে শোয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। সযত্নে গাড়ীতে তুলে বালিশের উপর শুইয়ে নিয়ে এসো আমার কাছে। বুঝলে?

কুকুরটি বার তিনেক লেজ নেড়ে সম্মতি জানালো—বুঝেছি। আর দ্রুত বেরিয়ে গেলো।



কিছুক্ষণ পরেই কাচঘেরা সুন্দর একটি ঘোড়া-গাড়ী পরীর ঘরের কাছে এসে থামলো। গাড়ীর ভিতরটা বেশ ছিমছাম। ক্রীমের মতো সাদা আর বিস্কুটের মতো হলদে অসংখ্য পালক দিয়ে সজ্জিত। গাড়ীটি কারা টেনে নিয়ে চলতো জানো? এক শ' জোড়া সাদা ইঁদুর।

ঘোড়া-গাড়ীর উপরে সেই কুকুরটি ছিলো বসে। তার হাতে একটা চাবুক। এই চাবুকই ছিলো গাড়ীটিকে ডানে কিংবা বায়ে চালিয়ে নিয়ে যাবার অস্ত্র। বড্ড ব্যস্ত থাকতে হোত চাবুকটিকে।

ঠিক পনেরো মিনিট পরেই ঘোড়া-গাড়ীটি ফিরে এলো। দরজার সামনেই অপেক্ষা করছিলো পরী। সে বেচারা পুতুলকে কোলে করে নিয়ে ঢুকলো গিয়ে ছোট একটা ঘরের মধ্যে। আহা কি সন্দরভাবেই না সাজানো ঘরটা। অসংখ্য মণি-মাণিক্য শোভা পাচ্ছিলো ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। দেখলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তৎক্ষণাৎ সবচেয়ে বড় ডাক্তারদের ডাকা হোল। তারা আসতে দেরী করেনি মোটেই। একজনের পর একজন চলে এসেছে সংগে সংগে।

ডাক্তারদের মধ্যে ছিলো কাক, পেঁচা, ঝিঁ-ঝি পোকা। এরা সবাই ভণ্ডুলের আশপাশে দাঁড়িয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করলো—

—মশাই, বলুন তো এই হতভাগ্য পুতুলটি মৃত না জীবিত?

এই প্রশ্নে সবাচেয়ে প্রথম এগিয়ে এলো কাক। সে ভণ্ডুলের দেহের কোনো কোনো জায়গা টিপে দেখলো। নাক, হাত ও পায়ের ছোট ছোট আংগুলগুলি টেনেটুনে দেখলো। তারপর জোর গলায় বললো—

—আমার মতে এই পুতুল একেবারেই মরে গেছে। আর যদি একান্তই না মরে গিয়ে থাকে তবে বেঁচে আছে নিশ্চয়ই।



পেঁচা তার অভিমত জানাতে গিয়ে বললো—

—দুঃখের বিষয় আমার মাননীয় বন্ধু এবং সহকর্মী কাকের কথা মানতে পারলাম না। আমার মতে পুতুল বেঁচে আছে। আর যদি একান্তই বেঁচে না থেকে থাকে তবে মরে গেছে নিশ্চয়ই।

পরে ঝিঁ-ঝি পোকাকে জিজ্ঞেস করা হোল।

—আপনি কি বলেন ডাক্তার সাহেব?

—কি আর বলবো। কোনো জ্ঞানী ডাক্তার না বুঝে শুনে তার অভিমত প্রকাশ করার চেয়ে না করাই ভালো। যা হোক, এই পুতুলের চেহারা আমার কাছে নতুন নয়। অনেকদিন থেকেই একে আমি চিনি।

এদিকে ভণ্ডুল তখন পর্যন্ত একেবারে কাঠের মতো অসাড় হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ সে একটু নড়েচড়ে উঠলো। খাটখানাও নড়ে উঠলো সেই সাথে। ঝিঁ-ঝি পোকা আবার বললো—

—এই পুতুল আসলে একটা বদমায়েশ।

কথাটা শুনে ভণ্ডুল একবার তাকালো। আবার সংগে সংগেই চোখ বন্ধ করে দিলো।

—একটা অলস, অবাধ্য আর বাজে ধরনের ছেলে।

এবারে ভণ্ডুল চাদরে মুখ ঢেকে নিলো।

—সত্যিই একটা অবাধ্য ছেলে এই ভণ্ডুল। ঝিঁ-ঝি পোকা আবার বললো। এর বেচারা বুড়ো বাবাকে দুঃখে দুঃখে মেরে ফেলেছে।



অতঃপর ঘরের মধ্যে কার কান্না-কাটি আর হা-হুতাশ শোনা যেতে লাগলো।

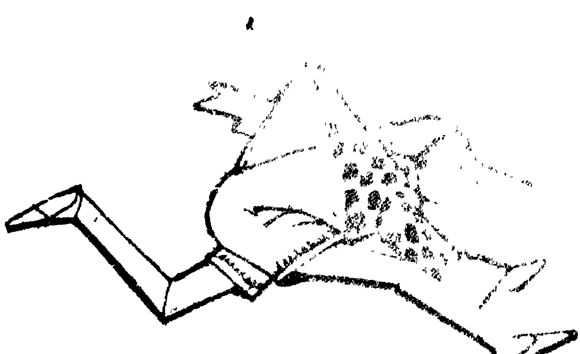
তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো, যখন চাদর তুলে ভণ্ডুলকেই হা-হুতাশ আর কান্নাকাটি করতে দেখা গেলো তখন উপস্থিত সবাই কতোখানি বিস্মিত হয়েছিলো।

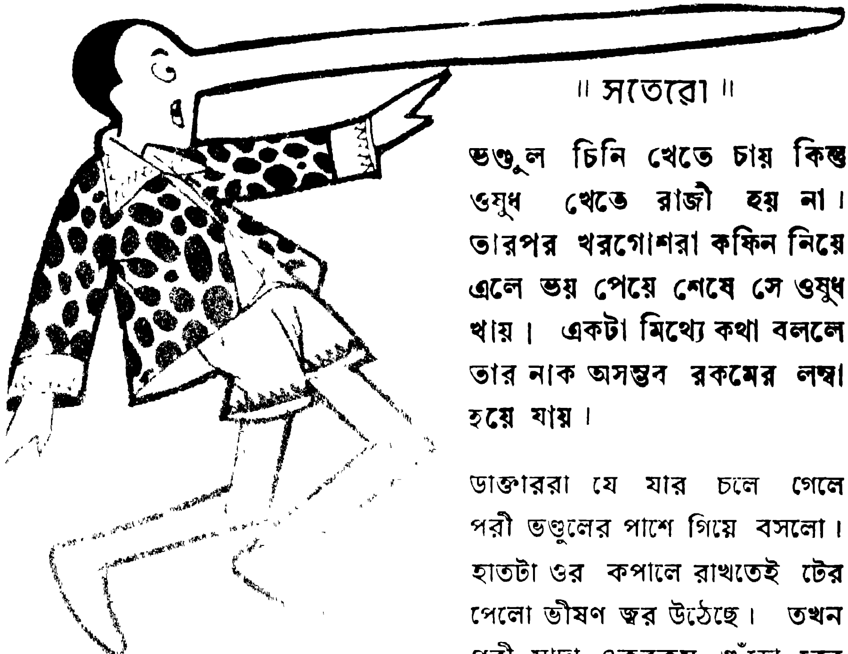
ডাক্তার কাক সুযোগ পেয়ে সদর্পে বললো—

—মরে গিয়েও যখন কান্নাকাটি করছে তার মানে হোল গিয়ে রোগী সুস্থতার দিকে যাচ্ছে।

পেঁচা ডাক্তার প্রতিবাদ করে বললো—

—দুঃখের বিষয় আমার মাননীয় বন্ধু ও সহকর্মীর মতের বিরুদ্ধে যেতে হোল আমাকে। আমার কথা হোল, যখন মৃত ব্যক্তি কাঁদে তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে সে মরতে চায় না।





॥ সতেরো ॥

ভণ্ডুল চিনি খেতে চায় কিন্তু ওষুধ খেতে রাজী হয় না। তারপর খরগোশরা কফিন নিয়ে এলে ভয় পেয়ে শেষে সে ওষুধ খায়। একটা মিথ্যে কথা বললে তার নাক অসম্ভব রকমের লম্বা হয়ে যায়।

ডাক্তাররা যে যার চলে গেলে পরী ভণ্ডুলের পাশে গিয়ে বসলো। হাতটা ওর কপালে রাখতেই টের পেলো ভীষণ জ্বর উঠেছে। তখন পরী সাদা একরকম গুঁড়ো বের করে আধ গ্লাস পানির মধ্যে ঢেলে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তারপর পুতুলকে দিয়ে স্নেহের স্বরে বললো—

—নাও, এটুকু খেয়ে নাও। অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

ভণ্ডুল গ্লাসের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ বেঁকিয়ে ফেললো। ইনিয়ে বিনিয়ে জিজ্ঞেস করলো—

—মিষ্টি না তিতে?

—তিতে। কিন্তু খেলে যে তোমারই উপকার হবে!

—তিতে হলে খাবো না আমি।

—আমার কথা শোনো—খাও।

—আমি তিতে পছন্দ করি না।

—খাও! খেলে তোমাকে এক চামচ চিনি দেবো। তিতে যাবে কেটে। দেখো মুখ মিষ্টি লাগবে তখন।

—চিনির চামচ কোথায়?

—এই, এই তো! একটা সোনার কৌটা থেকে চামচটা বের করে পরী বললো।



—আগে চিনি দাও। পরে ওই তিতে পানি খাবো।

—ঠিক ঠিক বলছো ?

—হঁ্যা।

পরী চিনি দিন। ভণ্ডুল সেই চিনিগুলো [illegible] গিলে ফেলে ঠোঁ[illegible] চাটতে [illegible] আর বল[illegible]

—যদি চিনিটাই ওষুধ হোত তাহলে কি মজাই না হোত! রোজ রোজ খেতাম আমি।

—নাও, এখন তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো। এই ওষুধটুকু খাও। দেখবে, তুমি শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্লাসটা হাতে নিলো ভণ্ডুল। গ্লাসে নাক ঢুকিয়ে গন্ধ শুঁকলো। তারপর নাক কুঞ্চিত করে বললো—

—অতিরিক্ত তিতে, অতিরিক্ত তিতে! এ আমি খেতে পারবো না।

—সে কি! এখনো মুখেই দিলে না—কি করে বুঝলে অতিরিক্ত তিতে ?

—বুঝতে পেরেছি। গন্ধ শুঁকেই টের পেয়েছি। যদি আরেক চামচ চিনি দেন তাহলে খাবো।

ধৈর্য হারালো না পরী। কি আর করবে? মাতৃস্নেহের পবিত্র ছায়া পড়ে গেছে যে! সে ভণ্ডুলের মুখে আরেকটু চিনি দিয়ে গ্লাসটা তার হাতে দিলো আবার।

—নাও, এবারে খেয়ে ফেলো।

—এমনি করে খেতে পারি না। পুতুল মুখ বিকৃত করে বললো।

—কেনো?

—আমার পায়ের উপরকার বালিশটা বড্ড বিরক্ত করছে।

পরী বালিশ সরিয়ে দিলো।

—না হোল না। এমনি করেও খেতে পারবো না আমি। আগের মতোই বলে উঠলো পুতুল।

—এবারে আবার কোন্ অসুবিধাটা হোল?

—ওই যে ঘরের দরজাটা অর্ধেক খোলা। আমার খারাপ লাগছে খুব। পরী গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। তবুও পুতুল কেঁদে কেটে একাকার করে ফেললো।

—বাচ্চা আমার, সাবধানের মার নেই। নতুবা পরে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

—কিচ্ছু যায় আসে না।

—তোমার রোগ যে খুব সাংঘাতিক।

—কিচ্ছু যায় আসে না।

—এ জ্বর তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে।

—কিচ্ছু যায় আসে না।

—তোমার কি মরবার ভয় নেই?

—নেই। একটুও নেই। এই তিতে ওষুধ খাওয়ার চেয়ে মরা ভালো। সেই মুহূর্তে ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। আর কালো মিচমিচে চারটি খরগোশ ভিতরে ঢুকলো। তাদের কাঁধের উপরে এক একটা ছোট ছোট কফিন।

ভণ্ডুল ভয় পেয়ে বিছানাটার উপরে সরে দাঁড়ালো। আর উচ্চৈঃস্বরে বললো—

—কি চাও তোমরা?

সবচেয়ে মোটা খরগোশটি উত্তর দিলো—

—তোমাকে। তোমাকে নিতে এসেছি আমরা।

—আমাকে ? কিন্তু আমি তো মরিনি এখনো!

—এখনো মরোনি সত্যি। কিন্তু দেরীও নেই বেশী। কয়েকমিনিট বাকী আছে মাত্র। ওষুধটা খেলে কিন্তু তোমাকে আর মরতে হোত না। তুমি রোগমুক্ত হতে। বেঁচে যেতে। অথচ তা করলে না তুমি।

—ওগো আমার পরী, এখন কি করবো আমি ? [illegible]লে হাঁফাতে লাগলো পুতুল। এক্ষুণি দয়া করে [illegible] ওষুধটা খা[illegible] দা[illegible] —আমি মরতে চাই না। [illegible]



তা[illegible] থেকে ও[illegible] গ্লাস[illegible] করব[illegible]য়েই এব[illegible] সবটুকু গিলে ফে[illegible]ণ্ডুল। [illegible]ই দেখে[illegible]গোশ[illegible] সংগে[illegible] উ[illegible]

—যাক [illegible]বের জন্যে চলে গেলাম।

সত্যি সত্যিই চলে গেলো ওরা। ছোট ছোট সেই বাক্সগুলো যার যার কাঁধে তুলে নিয়ে বিড়-বিড় করে কি সব বলতে বলতে বেরিয়ে গেলো। অল্প সময়ের মধ্যেই ভণ্ডুল সেরে উঠলো। বিছানার একঘেঁয়েমি থেকে রেহাই পেয়ে বাইরে বেরুবার সুযোগ পেলো।

আসলে কিন্তু এই কাঠের পুতুলটার অসুখ বিসুখ হোত খুবই কম। হলেও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেতো।

আনন্দে ঘর মাতিয়ে তুললো পুতুল। মোরগের মতো ডিগবাজী খেতে লাগলো। তাই দেখে পরী বললো—

—দেখেছো ওষুধ খেয়েই ভালো হয়ে গেলে।

—তা ঠিক। আমার জীবনটাই ফিরিয়ে দিয়েছে।

—তবে কেনো এই ওষুধ খাবার জন্যে তোমাকে অতো তোষামোদ করতে হোল?

—সব ছেলেরাইতো অসুখের চেয়ে ওষুধকে ভয় করে।

—লজ্জার কথা। ছেলেদের জানা দরকার -কোনো ভালো ওষুধ সময় মতো খেলে অনেক বড় বড় রোগ থেকে, এমনকি মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

—ঠিক আছে। আর কোনোদিন এমন হবে না। তাছাড়া, সেই খরগোশ চারটি আর তাদের কাঠের বাক্সগুলোর কথা বেশ মনে আছে আমার। কি ভয়ই না পেয়েছিলাম বাবা! ওদের দেখেই তো ওষুধগুলো খেয়ে ফেললাম তক্ষুণি।

—বেশ ভালোই করেছো। এখন আমার কাছে এসে বলো তুমি কেমন করে সেই গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিলে।

—ব্যাপারটা শুনুন তাহলে। মাস্টার ইয়াংকি নামের এক পুতুল খেলোয়াড় কয়েকটা সোনার মোহর আমাকে দিয়ে বলেছিলেন—'তোমার বাবাকে নিয়ে দিও।'

কিন্তু পথিমধ্যে একটা নেকড়ে বাঘ ও একটা বিড়াল এই চমৎকার দুটি লোকের সাথে আমার পরিচয় হোল। ওরা আমাকে বললো—'তুমি কি চাও তোমার ওই সোনার টাকাগুলো এক হাজার কিংবা দু' হাজার হয়ে যাক? তাহলে আমাদের সংগে এসো। আমরা তোমাকে আশ্চর্য ক্ষেতে নিয়ে যাবো।'

আমি বললাম—চলো যাই।

যেতে যেতে যেতে পথিমধ্যে হঠাৎ বললো—

—এসো এই লাল চিংড়ির দোকানে একটু বিশ্রাম নিয়ে যাই। মাঝরাতে উঠে আবার রওনা করবো।

ওদের কথামতোই উঠলাম সেখানে। মাঝরাতে জেগে উঠে দেখি ওরা কেউ নেই। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠবার আগেই নাকি ওরা চলে গেছে।

কি আর করি - সেই রাতে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে। হঠাৎ পথে দু'জন গুণ্ডার সাথে দেখা। কয়লার বস্তার মধ্যে লুকিয়েছিলো তারা। আমাকে দেখেই গর্জে উঠলো। বললো—

— টাকা পয়সা যা আছে শীগ্গির বের করে দাও।

আমি বললাম--

—আমার কাছে তো কোনো টাকা পয়সা নেই।

আমি কিন্তু তখন সেই চারটি মোহর মুখের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওরা টের পেয়ে আমার মুখের মধ্যে হাত ঢুকাতে চেষ্টা করলো। আমি এক কামড়ে হাতটাই কেটে দিলাম। তারপর যেই থুতু করে ফেলে দিয়েছি অমনি দেখি সেতো হাত নয়— একটা বিড়ালের পা।

বেগতিক দেখে আমি দৌড়ে পালালাম। গুণ্ডারাও ছুটলো আমার পিছনে। আমি আরো বেশী জোরে ছুটতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত ওরাও আমাকে ধরেই ফেললো। একটা দড়ি দিয়ে আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই জংগলের বড় আমগাছটায় ঝুলিয়ে রেখে চলে গেলো। যাবার সময় বলে গেলো—

—কাল ফিরে এসে যেন দেখি তুমি মরে গিয়েছো। তোমার মখটিও খোলা রয়েছে। আর আমরা তখন সহজেই তোমার মুখের ভিতরকার টাকা বের করে নেবো।

পরী শুনছিলো মন দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলো—

—সেই চারটি মোহর এখন কোথায়?

—সেগুলো হারিয়ে ফেলেছি। ভণ্ডুল উত্তর দিলো।

আসলে কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা। কারণ, তখন টাকাগুলো ওর পকেটেই ছিলো।

ভণ্ডুল যেই না এই মিথ্যে কথাগুলো বলেছে অমনি তার নাক সংগে সংগে আরো দুই ইঞ্চি বেড়ে গেলো।

—কোথায় হারিয়ে ফেলেছো?

—ওই জংগলের মধ্যে।

এই দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বলতেই নাক আরো বাড়তে লাগলো।

—যদি ওই জংগলেই হারিয়ে থাকে আমরা খোঁজ নেবো এবং নিশ্চয়ই পাবে। পরী বললো। যা কিছুই হারাক না কেনো এখানে সবই পাওয়া যায় আবার।

এবারে পুতুল কিন্তু বেশ অসুবিধায় পড়ে গেলো। বললো, —ওহো, ঠিক মনে পড়েছে। সেই টাকাগুলো হারায়নি। সেই যে ওষুধ খেয়েছিলাম। তারই সংগে ভুল করে খেয়ে ফেলেছি।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মিথ্যা কথা বললো ভণ্ডুল। আর যাবে কোথায়—নাক লম্বা হতে হতে এমন আকার ধারণ করলো যে শেষে আর কোনো দিকেই ঘুরতে পারছে না সে। এক-আধটুকু ঘুরলেই হয় বিছানা নতুবা গ্লাস ও অন্যান্য জিনিস-পত্তরের সাথে ধাক্কা লাগছে। অন্যদিকে ফিরতে গেলে দেয়ালে কিংবা দরজার সংগে বেধে যাচ্ছে। মাথাটা একটুখানি উপরের দিকে তুললেই পরীর চোখে লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকছে বেশী। এসব দেখে পরীতো হেসেই খুন।

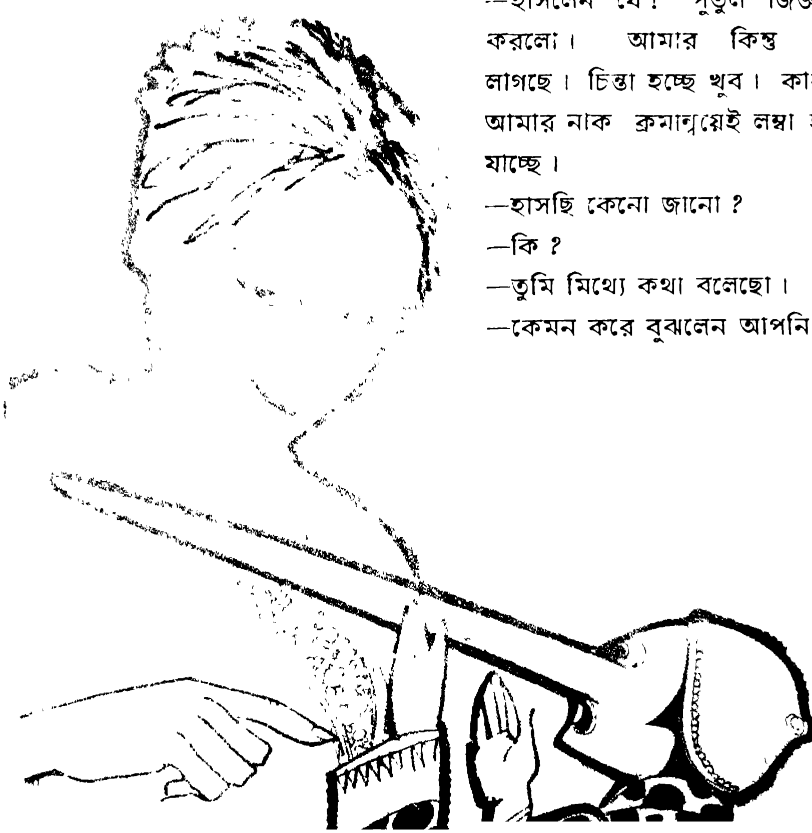
—হাসলেন যে! পুতুল জিজ্ঞাসা করলো। আমার কিন্তু ভয় লাগছে। চিন্তা হচ্ছে খুব। কারণ, আমার নাক ক্রমান্বয়েই লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

—হাসছি কেনো জানো ?

—কি ?

—তুমি মিথ্যে কথা বলেছো।

—কেমন করে বুঝলেন আপনি ?



—বাচ্চা আমার, বুঝা যায়। মিথ্যেকথা সংগে সংগেই ধরা যায়। মিথ্যে কথা আবার দুরকম আছে তা জানো? কোনো কোনো মিথ্যা কথার খাটো পা রয়েছে। আবার কোনো কোনো মিথ্যেকথার আছে লম্বা নাক। তুমি সেই রকম মিথ্যে বলেছো—। যার লম্বা নাক রয়েছে। ভণ্ডুল কথাগুলো শুনে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো যেন। কোথায় লুকাবে বুঝতে না পেরে ঘর থেকে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। তার নাক এমন লম্বা হয়ে রয়েছে যে, দরজার ভিতর দিয়ে বেরুচ্ছে না।



॥ আঠারো ॥

নেকড়ে বাঘ আর বিড়ালের সংগে ভণ্ডুলের দেখা হয়ে যায় আবার। তারপর তাদের সংগে আশ্চর্য ক্ষেতে গিয়ে সোনার মোহর চারটি লাগিয়ে ফিরে আসে।

ভণ্ডুল কাতরাচ্ছে— হা'হুতাশ করছে।

কোনো কথা বলছে না পরী প্রায় ঘণ্টাখানেক। বুঝুক কেমন মজা। আহা, বড় দুরবস্থা বেচারা ভণ্ডুলের। এদিকে লম্বা নাক। ঘরের দরজা দিয়ে বেরুবার ক্ষমতা নেই। ঘরের মধ্যেই ছট্‌ফট্ করছে শুধু। আসলে কিন্তু পরী ওকে একটা সুশিক্ষাই দিতে চেয়েছিলো। জীবনে যেন কখনো মিথ্যেকথা না বলে ও। ছেলেদের জীবন মিথ্যে কথা বলাটাই সবচেয়ে বেশী দোষের।

পরী দেখলো যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে ভণ্ডুলের। চোখ দুটো ফুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে আর কি। ওর প্রতি বড্ড মায়া হোল তার। কি একটু ভেবে দুটো তালি বাজালো সে। সংকেত পেয়ে হাজার হাজার পাখী সেই ঘরে প্রবেশ করলো।

পাখীগুলো ছিলো 'কাঠঠোকরা'। ওরা এসে ভণ্ডুলের নাকের ডগায় বসে ঠুকরিয়ে নাকটা কেটে কেটে খেতে লাগলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লম্বা অদ্ভুত নাক স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

—পরী দিদি আমার, আপনি কতো ভালো। চোখ মুছে পুতুল বললো। আপনাকে কতো ভালো লাগে।

—আমিও তোমাকে ভালোবাসি। আমারও তোমাকে ভালো লাগে। পরী উত্তর দিলো। তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও থাকতে পারো। ছোট ভাইয়ের মতোই থাকবে। আমি তোমার একটা খুব ভালো দিদি হবো।

—নিশ্চয়ই থাকবো। কিন্তু আমার বেচারা বাবা?

—সেসব ঠিক করে ফেলেছি। তোমার বাবার কাছে খবর চলেও গেছে এতোক্ষণে। তিনি সন্ধ্যের আগেই হয়তো এখানে এসে পেঁৗছাবেন।

—সত্যিই? কথাটা উচ্চারণ করেই ভণ্ডুল আনন্দে নেচে নেচে বললো।—

তাহলে দিদি, বাবার সাথে দেখা হতে যাচ্ছে আমার। কতো অনুগ্রহ আপনার। এখন আর এক মুহূর্তও আপক্ষা করবার ধৈর্য আমার নেই। আমি নিজেই যাচ্ছি সেখানে। শুধু আপনার অনুমতি পেলেই হয়। তারপর গিয়ে চুমোয় ভরে দেবো বাবাকে আমার। সত্যিই তিনি আমার জন্যে অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েছেন।

—যাও। আমার কোনোই আপত্তি নেই। কিন্তু সাবধান, বনের মধ্যে হারিয়ে না যাও আবার। ওই জংগলের পথ ধরে গেলে নিশ্চয়ই তার সংগে দেখা হয়ে যাবে তোমার।



ভণ্ডুল চলে গেলো তক্ষুণি। আর বন-জংগল দিয়ে একটা হরিণের মতো দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ সেই আম-গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। পাশের ঝোপটার থেকে কারো পায়ের শব্দের মতো শোনা গেলো। কারা ছিলো জানো? সেই নেকড়ে বাঘ আর বিড়াল। যারা আগেও একবার সংগী হয়ে ওর সর্বনাশ করতে চেয়েছিলো। যাদের

সংগে একসাথে লাল চিংড়ি মাছের দোকানে বসে খেয়েছিলো। সেই বন্ধু জুটি।

—এই যে ভাই ভণ্ডুল! তুমি কেমন করে এলে এখানে? নেকড়ে বাঘ জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে বললো।

—কেমন করে তুমি এলে? বিড়াল তার অভ্যাসজনিত সায় দিলো।

—হায় হায়, সেকথা বলো না ভাই। সে এক লম্বা চওড়া ইতিহাস। পুতুল বললো। ধীরে ধীরে সবই বলবো তোমাদের।

শোনো ব্যাপারটা তাহলে। পরশু রাতে তো তোমরা আমাকে সেই খাবার দোকানে রেখে গেলে। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে একা একা যাচ্ছিলাম। পথে সেকি বিপদ! দুটো গুণ্ডার হাতে পড়ে গেলাম।

—ডাকাত! বাপরে বাপ! আচ্ছা, তারা কিছু চাইলো তোমার কাছে?

—তারা আমার সোনার টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলো।

—বদমায়েশ। নেকড়ে বললো।

—বদমায়েশ—বদমায়েশ। বিড়ালও যোগ দিলো সেই সাথে।

ভণ্ডুল আবার বলতে লাগলো—

—কোনো রকমে ওদের চোখ থেকে এড়িয়ে পালাতে শুরু করে দিলাম।

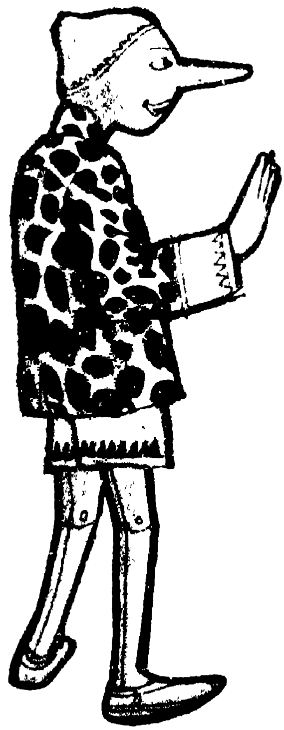
ওরাও আমাকে তাড়া করে আমার পিছন পিছন ছুটতে লাগলো। আমাকে ধরেই ফেললো শেষ পর্যন্ত। তারপর আমার গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস পরিয়ে ওই বড় আমগাছটার ডালের সংগে ঝুলিয়ে দিলো।

গাছটা নিকটেই ছিলো। ভণ্ডুল সেটাকে আংগুলের ইশারায় দেখিয়ে দিলো।

—আহা-হা-হা। এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে। নেকড়ে বাঘ বললো আফসোস করে। কি সংসারের ভিতর দিয়েই না আমাদের জীবন যাপন করতে হচ্ছে! আমাদের মতো সৎলোকের নিরাপদ আশ্রয় কোথায়?

এমনি অনেক কথাই বলাবলি করলো ওরা। হঠাৎ কেমন করে টের পেয়ে গেলো ভণ্ডুল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে বিড়াল। তার সামনের

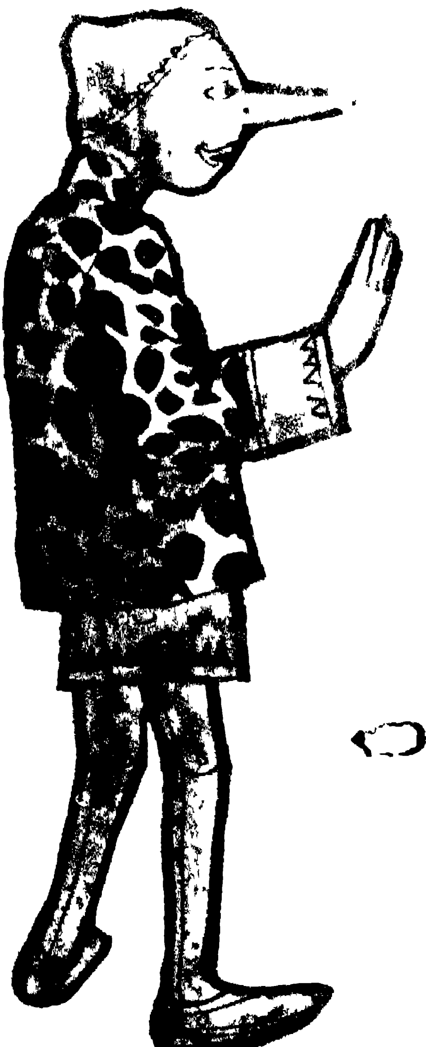
একটা পা নেই। তাই দেখে সে জিজ্ঞেস করলো—
—তোমার পা কি হোল?
কি যেন বলতে গেলো বিড়াল। কিন্তু মুখে বেধে গেলো তার। নেকড়ে বাঘ টের পেয়ে বললো—
—শোনো ভণ্ডুল সাহেব। আমার বন্ধু একটু বেশী লাজুক কিনা তাই তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে দ্বিধাবোধ করছে। আমিই বলছি সব। ঘণ্টাখানেক আগে আমরা এক বুড়ো ভালুকের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। সে বেচারা খিদের জ্বালায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। আমাদের কাছে কিছু খাবার ভিক্ষা চাইলো। কি খেতে দেবো তাকে? সামান্য একটা হাড় পর্যন্ত ছিলো না আমাদের কাছে। তখন আমার বন্ধু অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে দাঁত দিয়ে তার সামনের ডান পা-টা কেটে তাকে খেতে দিলো। সত্যিই, আমার বন্ধু অমন না করলে বেচারা ভালুকের যে কি দুর্দশাই না হোত! খিদেয় মরেই যেতো। উহ্, সে কি করুণ দৃশ্য!



নেকড়ে কথাগুলো বলেই চোখ মুছলো। তাই দেখে ভণ্ডুলের প্রাণটাও যেন গলে গেলো। সে বিড়ালের কাছে গিয়ে কানে কানে বললো—
—যদি গোটা বিড়ালগুলোই তোমার মতো হয় তবে ইঁদুরেরা ধন্য হবে।
নেকড়ে বাঘ কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলো। বললো—
—এখানে কি করছো?
—আমার বাবার জন্যে অপেক্ষা করছি। তার এক্ষুণি এসে যাবার কথা।
—তোমার সেই সোনার টাকা?

—আমার পকেটে। কিন্তু একটা কমে গেছে। লাল চিংড়ি মাছের দোকানে খরচ করে ফেলেছি।

—তুমি এখনো ভালো করে চিন্তা করে দেখো—সামান্য চারটি টাকার পরিবর্তে কালই এক হাজার কিংবা দু'হাজার টাকা পেতে পারো তুমি। এমন সুযোগ হারানো তোমার ঠিক হবে না। আশ্চর্য! তুমি কেনো আমার উপদেশ শুনছো না! কেনো ওগুলো আশ্চর্য ক্ষেতে লাগাতে যাচ্ছো না!



—আজ অসম্ভব। অন্য আরেকদিন যাবো। বললো ভণ্ডুল।

—আরেকদিন হলে দেরী হয়ে যাবে যে!

—কেনো?

—কারণ,সেই খামারটা এক মহাজন কিনে নিয়েছে। কাল থেকে আর কেউ সেখানে পয়সা বুনতে পারবে না।

—এখান থেকে কতোদূর?

—মাত্র মাইল খানেক। আমাদের সংগে যাবে? আধা ঘণ্টার মধ্যেই ওখানে পেঁৗছে যাবো। তারপর কোনো রকমে গর্ত করে টাকাগুলো লাগিয়ে একটু অপেক্ষা করলেই বাস—দু' হাজার। সন্ধ্যের দিকে তুমি ভরা পকেট

নিয়েই ফিরে আসতে পারবে। বলো যাবে ?

কি বলবে ভেবেই পাচ্ছে না ভণ্ডুল। শুধু ইতস্তত করতে লাগলো। নতুন করে আবার বুড়ো বাবা বাটুল মিয়া আর ঝিঁ ঝি পোকার কথা মনে পড়ে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সব ভুলে গেলো। হাবা ছেলেদের মতো বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে বসলো। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললো—

—চলুন যাবো। আপনাদের সাথেই যাবো।

অতঃপর নেকড়ে বাঘ আর বিড়ালের পথ ধরে এগিয়ে চললো ভণ্ডুল। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। কিন্তু পথ আর কমছে না। একটানা আটদিন হাঁটার পর অবশেষে একটা শহরে গিয়ে পেঁাছলো ওরা। শহরটার নাম—আজব শহর।

আজবই বটে। শহরটায় প্রবেশ করেই ভণ্ডুল অনেকগুলো বিশ্রী ধরনের কুকুর দেখতে পেলো। লোমশূন্য কুকুরগুলো রাস্তায় ছট্‌-ফট্‌ করছিলো খিদের জ্বালায়। ভেড়াগুলোরও একই অবস্থা। লোমশূন্য অবস্থায় শীতে কাঁপছে। মুরগীগুলোর পাখ্‌না ও মাথার ফুল কোনোটাই নেই। সামান্য ক'টা চা'লের জন্যে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছে তারা। বড় বড় প্রজাপতিগুলো উড়তে পারছে না। কি দিয়ে উড়বে ? তাদের সুন্দর রঙীন পাখাগুলো পেটের দায়ে বিক্রি করে দিয়েছে যে ! ময়ূর তার লেজ হারিয়ে ভয়ানক লজ্জার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। শুধুমাত্র গরীব আর ভিক্ষুকদের নিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ী যাতায়াত করছিলো। এরা হলো নেকড়ে বাঘ, কোকিল, আর শকুন। ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করলো—

—আশ্চর্যের ক্ষেত কোথায় ?

—এখানেই। ওইতো একটু সামনে।

ওরা শহরের ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে একটা ছোট্ট নির্জন ক্ষেতের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। ক্ষেতটি দেখতে আর সব ক্ষেতের মতোই।

—এই তো এসে গেছি। নেকড়ে বললো পুতুলকে। এখানে একটা ছোট-খাটো গর্ত খুঁড়ে ফেলো। আর তার মধ্যে তোমার টাকাগুলো রেখে মাটি চাপা দিয়ে দাও।

ভণ্ডুল তা-ই করলো। করতে বাধ্য হোল।

গর্ত তৈরী হোল। টাকা চারিটিও তার ভিতরে রাখা হোল। পরে মাটি চাপা দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিলো ভণ্ডুল।

নেকড়ে বাঘ আবার বললো—

—এখন পুকুর থেকে এক বালতি পানি নিয়ে এসো। আর ওর উপরে ঢেলে দাও।

এবারেও তা-ই করলো ভণ্ডুল। পুকুরের দিকে গেলো পানি আনতে। কিন্তু বালতি? বালতি কোথায় পাবে এখন। শেষকালে মাথায় বুদ্ধি এলো। নিজের জুতো খুলে তাতে করে পানি এনে ঢালতে লাগলো সে। পানির কাজ শেষ হলে পরে জিজ্ঞেস করলো—

—আর কি করতে হবে?

—কিচ্ছু করতে হবে না। নেকড়ে বাঘ উত্তর দিলো। এখন আমরা চলে যেতে পারি। আর হ্যাঁ, মিনিট কুড়ি পরে ফিরে এসে ছোট ছোট একরকম গাছ দেখতে পাবে। গাছগুলোর থাকবে অজস্র শাখা-প্রশাখা।



টাকায় টাকায় ভরা থাকবে সব।

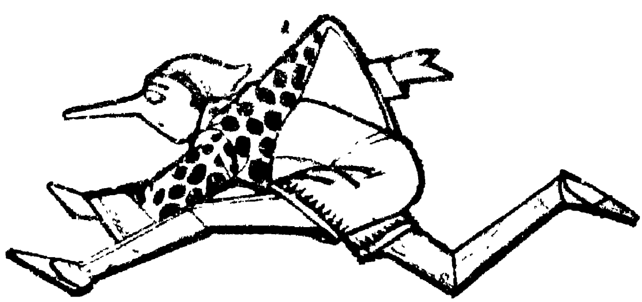
বেচারা পুতুলের তখন আর আনন্দ ধরে না। নেকড়ে বাঘ আর বিড়ালকে হাজার হাজার ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। তাদের এই উপকারের বিনিময়ে একটা চমৎকার উপহার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো। তখন সেই দুই দুষ্টু মিলে বললো—

—না-না, আমাদের উপহারে কাজ নেই। আমরা উপহার চাই না। এমনিতেই খুশি আমরা। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কেমন করে



বিনা পরিশ্রমে ধনী হতে পারো তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি। এর চেয়ে বড় উপহার আর আমাদের জন্যে কি হতে পারে?

এই কথা না বলে ভণ্ডুলকে সালাম ঠুকলো কয়েকবারই। আর সুন্দর ফসলের শুভেচ্ছা কামনা করে নিজেদের পথে পা বাড়ালো ওরা।



॥ উনিশ ॥

ভণ্ডুল চারমাস কারাগারে বন্দি থাকে। কারণ, তার টাকাগুলো চুরি হয়ে গিয়েছিলো।

আশ্চর্য ক্ষেত থেকে ফিরে এসে পুতুল মিনিট গোনতে শুরু করে দিলো। এক-দুই-তিন করে গোনছে তো গোনছেই।

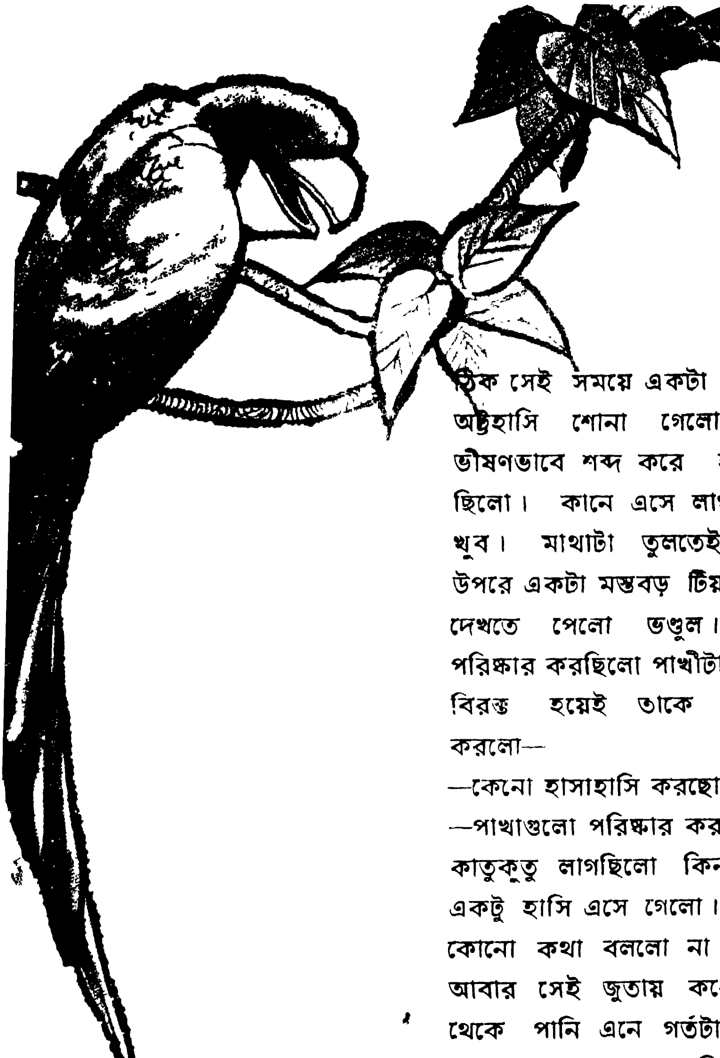
ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ খেয়াল হোল। আশ্চর্য ক্ষেতে যেতে হবে তো! দ্রুতবেগে চলছে ভণ্ডুল। প্রাণটা ধক্-ধক্ করছে। টিক্-টিক্ শব্দ হচ্ছে একটা দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। অনেক কিছুই ভাবতে হচ্ছে পুতুলকে।

—যদি এক হাজারের পরিবর্তে দু'হাজার পাই। অথবা দু'হাজারের পরিবর্তে পাঁচ হাজার পাই। ওহ্, তাহলে তো কথাই নেই! মস্তবড় একটা মহাজন বনে যাবো। আর হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই যদি মহাজন হ'তে পারি তবে প্রথমেই বাড়ী তৈরী করবো খুব সুন্দর দেখে। হাজার রুমের বাড়ী হবে সেটা। একহাজার কাঠের ঘোড়া আর বড়সড় একটা লাইব্রেরী ঘর থাকবে। লাইব্রেরীতে সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপি প্রভৃতিতে থাকবে ভরপুর।

এমনি আকাশকুসুম জল্পনা কল্পনা করতে করতে সেই আশ্চর্য ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হোল ভণ্ডুল। ভাবলো, সেখানে গিয়েই সেই ছোট ছোট গাছগুলি দেখতে পাবে। আহা, সোনার মোহরগুলি কি সুন্দরভাবেই না ঝুলছে সেখানে!

আশ্চর্য ক্ষেতে তো গেলো পুতুল। চারিদিকে লক্ষ্যও করলো ভালোভাবে। কিন্তু ওসব কিছুই দেখতে পেলো না সে। অবশেষে আরো শ'খানেক ফুট এগিয়ে গিয়ে তাকাতে লাগলো। তবও না। কিছুই দেখা গেলো না। তখন একটু সন্দেহ হোল ওর। আরো এগিয়ে একেবারে সেই গর্তের কাছে গেলো। কিন্তু সেখানেও কিছু নেই। যে সব হবার কথাবার্তা ছিলো নামগন্ধও নেই সে সবের।

এসব দেখে পুতুল চিন্তিত হয়ে পড়লো খুব। ওখানে দাঁড়িয়েই রইলো। আর মাথা চুলকিয়ে ভাবতে লাগলো।



ঠিক সেই সময়ে একটা অট্টহাসি শোনা গেলো। ভীষণভাবে শব্দ করে হাসছিলো। কানে এসে লাগছিলো খুব। মাথাটা তুলতেই গাছের উপরে একটা মস্তবড় টিয়াপাখীকে দেখতে পেলো ভণ্ডুল। পাখা পরিষ্কার করছিলো পাখীটা। পুতুল বিরক্ত হয়েই তাকে জিজ্ঞেস করলো—

—কেনো হাসাহাসি করছো ভাই ?

—পাখাগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে কাতুকুতু লাগছিলো কিনা তাই একটু হাসি এসে গেলো।

কোনো কথা বললো না পুতুল। আবার সেই জুতায় করে পুকুর থেকে পানি এনে গর্তটায় পানি দেবার কাজে মনোযোগ দিলো। কিন্তু হঠাৎ আবার সেই শব্দ। সেই অট্টহাসি আগের মতোই শোনা গেলো। বরং আগের চেয়েও এবারের হাসিটায় দুষ্টুমির আভাসটা একটু বেশী। হা-হা-হা-হা সেই ক্ষেতের নির্জনতায় ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

—এ কি! রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলো ভণ্ডুল। এতো অভদ্রভাবে হাসির কারণটা জানতে পারি কি ?

—হাসছিতো পেঁচাদের জন্যে।

—কেনো ?

—তারা সবাই বোকামিকে বিশ্বাস করে আর চতুরদের ফাঁদপাতা কলে ধরা পড়ে বলে।

—আমার কথাই বলছো, তাই না ?

—হ্যাঁ, ধরো তোমার কথাই। তুমি একটা আস্ত বোকামি করেছো।

—কেমন করে ?

—তোমার টাকাগুলো ওই ক্ষেতের মধ্যে বপন করে। ভেবেছিলে গাছগুলো লাউয়ের ডগার মতোই বেড়ে উঠবে, তাই না ? আমিও একদিন অমনি বিশ্বাস করেছিলাম। তাই আজও তার দুর্দশা ভোগ করছি। তখন বুঝতে পারিনি। এখন দেখছি সৎপথে পয়সা রোজগার করার পন্থা জানা চাই। নিজের কাজ নিজের বুদ্ধিতেই করা ভালো।

—তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। পুতুল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো।

টিয়াপাখী আবার বললো—

—বেশ। আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি শহরে থাকাকালীন নেকড়ে বাঘ আর বিড়াল এই ক্ষেতে এসেছিলো। এসে তাড়াতাড়ি করে গর্তটাকে খুঁড়ে সোনার টাকাগুলো বের করে নিয়ে দে চম্পট! একেবারে হাওয়া হয়ে গেলো যেন।



—সে কি !

—হ্যাঁ, বাতাসের আগে পালিয়ে গেছে তারা। কোথায় চলে গেছে এতোক্ষণ !

ভণ্ডুল বোকার মতো হা করে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারলো না টিয়া পাখীর

কথাটা। সে সেই গর্ত থেকে মাটি তুলতে শুরু করে দিলো। তুলছে তো তুলছেই। শেষ পর্যন্ত ঘরের মতো একটা বিরাট গর্ত হয়ে গেলো সেখানে। তবু টাকার কোনো সন্ধানই মিললো না।

তোমরা এখন বুঝতেই পারছো ভণ্ডুলের অবস্থাটা তখন কি। বেচারা কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে সোজা শহরের দিকে দৌড়ালো। সেখানে গিয়ে বদমাস দুটোকে ধরবার জন্যে নালিশ জানালো।

বিচার করছিলো একটা বানর। বয়সে সে বুড়ো। সবচেয়ে সম্মানের বস্তু ছিলো তার মুখের লম্বা লম্বা সাদা দাঁড়ি। তার চেয়েও সম্মান পেতো তার চোখের বিনা গ্লাসের চশমাটা। সব সময়ের জন্যেই চোখে রাখতো সেটাকে। কেননা, অনেকদিন থেকে চোখের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলো সে।



ভণ্ডুল বিচারকের সামনে একে একে সেই অন্যায় চুরির বর্ণনা ব্যক্ত করলো। বদমায়েসদের নাম ও ঠিকানা দিয়ে বিচার চাইলো।

বিচারক অনেক ধৈর্য আর সহানুভূতির সংগে শুনলো সব। পুতুলটির অসহায় অবস্থা দেখে তার চোখে পানি এলো। মমতা হোল খুব। কিন্তু পুতুলকে কিছুই বললো না তখন। শুধু একটা বোতাম টিপে দিলো। ঘণ্টা বেজে উঠলো ক্রিং-ক্রিং করে। আর সংগে সংগে একটা মোটা ধরনের কুকুর এসে হাজির। পুলিশের পোশাক-আশাক তার গায়ে। বিচারক ভণ্ডুলকে দেখিয়ে সেই পুলিশকে বললো—

—চোর এই বেচারা ছেলেটার কাছ থেকে চারটে সোনার মোহর চুরি করে নিয়ে গেছে। একে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করো।

দমলো না পুতুল। তার উপর এই অবিচার হ'তে দেখে প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু পুলিশরা কি তাই শোনে? সময় নষ্ট না করে মুখ বেঁধে ওকে কারাগারে নিয়ে গেলো।

চারমাস কাটলো সেখানে। লম্বা লম্বা চারটে মাস। আরো বেশী থাকতে হোত পুতুলকে। যদি ভাগ্যে সুন্দর সুযোগটা না আসতো।

সেই শহরে রাজত্ব করতো এক যুবক সম্রাট। শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের সৈন্য সামন্ত নিয়ে খুব আনন্দে ডুবেছিলো তখন। সে অনেক ধুমধাম। যুদ্ধে জয়ী হবার আনন্দ যে অনেক! একদিন আঁতশ বাজীর অহরহ শব্দে আকাশটা মুখরিত হয়ে উঠলো। সম্রাটের আদেশ হোল—



উৎসবে যেন কারাগারের দ্বার খুলে রাখা হয়।

বাস্তবিকই হোল তাই। লোহার বড় বড় দরজাগুলো খুলে রেখে দিলো পাহারাদাররা।

ভণ্ডুল সেই কারাগারের পাহারাদারকে বললো—

—যদি অন্যসব কয়েদীরা বেরিয়ে যায় আমিও কিন্তু যাবো তাহলে।

—না, আপনি নয়। কারণ, আপনি একজন ভালোলোক। পুতুল আবার বললো—

—মাফ করবেন। আমি একজন দুষ্টু লোক।

—বেশ, তাহলে যেতে পারেন। পাহারাদার বললো। আর টুপি তুলে সসম্মানে কারাগারের দরজা খুলে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলো।

॥ কুড়ি ॥

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে পুতুল পরীর ঘরের দিকে যাত্রা করে। পথে যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে একটা ভয়ংকর সাপের সংগে দেখা হয়ে যায়। তারপর ঘটনাক্রমে মারা কলে আট্‌কা পড়ে।

ছাড়া পেয়ে ভণ্ডুলের সেকি আনন্দ তা তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। আর অপেক্ষা না করে তক্ষুণি সে শহর থেকে বের হয়ে পরীর সেই ছোট্ট ঘরের দিকে রওনা হোল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। টুপ-টাপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো একটানাভাবে। রাস্তায় কাদা জমে গেছে অনেক। পা ফেলতে না ফেলতেই অর্ধেকটা ডুবে যায়। কিন্তু পুতুলের ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তার বাবা এবং নীলকেশী দিদিকে দেখবার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে মন। হরিণের মতো ছুটে চলেছে সে। পথ অতিক্রম করতে গিয়ে কাদা-পানির ছিটে লেগে সমস্ত গা গেছে ভিজে। তবুও লক্ষ্য নেই। মনের মধ্যে অনেক রকম প্রশ্নের আলোড়ন শুরু হয়েছে। সাধ্যমতো জবাবও দিচ্ছে তার।

—কতো বিপদই না গেলো। উপযুক্ত শাস্তিও পেলাম। সত্যিই আমি একটা ভয়ানক দুষ্টু পুতুল। পাষাণ করে রেখেছি মনটাকে। সব কিছুই নিজের বুদ্ধিতে করতে চাই। যারা আমাকে ভালোবাসে, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের বেশী—তাদের কথা শুনিনি আমি। কিন্তু এবারই শেষ। শপথ করে বলছি এবার—একটা বাধ্য এবং ভালো ছেলে হবো। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই দেখেছি—অবাধ্য ছেলেদের অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাদের কখনো ভালো হয় না। আচ্ছা, বাবা কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? পরীদিদির ঘরে কি বাবাকে পাবো? হায়, কতোদিন ধরে তাকে দেখিনি। এবার তাকে পেলে মনের সাধ মিটিয়ে চুমু খাবো। হাজার রকম আব্দার করবো।

হায়, কতো দুষ্টুমিই না করেছি! পরীদিদি কি ক্ষমা করবেন আমাকে? কতোই না আদর-সোহাগ পেয়েছি তার কাছ থেকে! বলতে গেলে আমি তো বেঁচে আছি শুধুমাত্র তারই দৌলতে। সত্যিই আমি কতো হৃদয়হীন এবং অকৃতজ্ঞ ছেলে।

এমনি অনেক ভাবনাই ভেবে চলেছে ভণ্ডুল। হঠাৎ ভয়ে থমকে দাঁড়ালো ও। দ্রুত তিন-চার হাত পিছিয়ে গেলো। ব্যাপার কি! রাস্তার উপরে কি ধরনের সাপ ওটা? গায়ের চামড়াগুলো সবুজ। চোখ দু'টো দিয়ে আগুন ঝরছে যেন। লেজ থেকে কারখানার চিমনির মতো ধুঁয়া বেরুচ্ছে। এ সব দেখে পুতুলের সেকি ভয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

একটু দূরে সরে গিয়ে পুতুল একটা পাথরের উপরে বসে রইলো। সাপ চলে যাক—পথ পরিষ্কার হোক তারই অপেক্ষা করতে লাগলো সেখানে বসে।

এক-দুই করে তিনটি ঘণ্টা কেটে গেলো। এদিকে বসে বসে কোমর ধরে গিয়েছে ভণ্ডুলের। কিন্তু সাপটা নড়ছে না একটুও। আগের মতোই পড়ে আছে সটান হয়ে। আগের মতোই চোখে আগুন জ্বলছে, লেজ থেকে ধুঁয়া বেরুচ্ছে। দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব।

পুতুল দেখলো মহাবিপদ! আর কতোক্ষণ এভাবে বসে থাকা চলে? সে তখন বুকে কিছুটা সাহস নিয়ে সাপের কাছাকাছি গিয়ে মৃদুগলায় বললো—

—সাপ সাহেব, আমি বাড়ী যাবো। দয়া করে পথ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান। আমাকে যেতে দিন।

কিন্তু কোনোই জবাব এলো না সাপের কাছ থেকে। যেমনি ছিলো তেমনি অনড় রইলো সে। পুতুল আবার আগের মতোই বললো—সাপ সাহেব, আমি বাড়ী যাবো। সেখানে আমার বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। অনেক কাল দেখিনি তাকে। দয়া করে আমাকে পথ দিন। —বলে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।



কিন্তু এবারেও কোনো জবাব মিললো না। বরং সাপটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠলো। তার চোখের সেই আগুন গেলো নিস্তেজ হয়ে। লেজ থেকে ধুঁয়া বেরুনো বন্ধ হোল। ভণ্ডুল



ভাবলো, মরেই গেছে বুঝি। তাই আনন্দে হাতের তালু ঘষতে লাগলো সে।

হঠাৎ কি ভেবে ফূর্তির চোটে সাপের উপর লাফিয়ে পড়লো ভণ্ডুল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সাপ ফোঁস করে গর্জে উঠলো। একটা বিরাট ফণা ধরে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

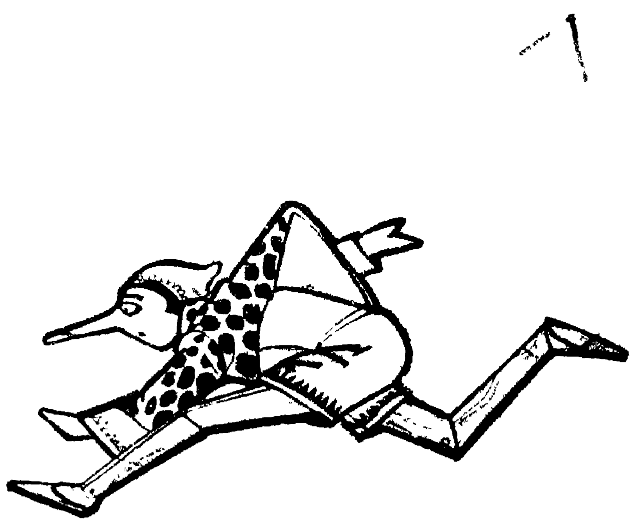
ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো পুতুল। সরে যাবার চেষ্টা করতেই হোচট্ খেয়ে গেলো পড়ে। ভয়ানক দুরবস্থা তখন তার। মাথাটা ঢুকে গেছে কাদার মধ্যে। আর পা আকাশের দিকে।

এ অবস্থায় থেকে পুতুলের তো প্রাণ যায় যায়। দাপাদাপি করছে শুধু। তাই দেখে সাপ তো হেসেই বাঁচে না। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেলো তার। গলার রগ গেলো ছিঁড়ে। শেষে সত্যি সত্যিই মারা গেলো সে।

বেঁচে গেলো ভণ্ডুল। বিপদ থেকে ছাড়া পেয়ে আবার সে পরীর ঘরের দিকে ছুট দিলো। অন্ধকার হবার আগেই গিয়ে পেঁৗছুতে হবে সেখানে। আরও প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলো।



কিন্তু এদিকে পেটে রয়েছে খিদের জ্বালা। কি করে এগিয়ে যাবে সে ? শেষকালে উপায়ন্তর না দেখে পাশেই নেমে পড়লো একটা আঙুরের ক্ষেতে। খিদে তো ঠেকানো যাক।
কিন্তু এখানেও একটা সর্বনাশ হয়ে গেলো ভণ্ডুলের। দ্রাক্ষালতার নীচে পেঁছিতেই খটাস্ করে একটা শব্দ হলো। তার পা দুটো একটা কলের মধ্যে আট্‌কা পড়ে গেলো। আঘাতের চোটে মাথাটা ঘুরে চরকির মতো পাক খেতে লাগলো। আকাশের অনেক অনেক তারার মতো কিসব ভেসে উঠলো চোখে।
বেচারা পুতুল তখন মারা কলটায় আট্‌কে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠলো। সাহায্য চেয়ে চেঁচাতে লাগলো। কিন্তু কেউ এলো না সেই মুহূর্তে।
ব্যাপারটা হয়েছে কি জানো ? কোনো এক চাষা সেই কলটি পেতে রেখে-ছিলো শিয়ালটা ধরার জন্যে। খুবই উৎপাত শুরু করে দিয়েছিলো শিয়ালটা। ওই অঞ্চলের হাঁস-মুরগী প্রভৃতির জন্যে সে ছিলো একটা মহামারী ধরনের।



।। একুশ ।।

চাষা ভণ্ডুলকে ধরে তার বাড়ী নিয়ে যায়। তারপর ওকে মুরগীর ঘরের জন্যে পাহারার কুকুর হিসেবে রাখে।

বিপাকে পড়ে কি কান্নাকাটি আর চেঁচামিচি পুতুলের! কেঁদে কেঁদে বহু অনুনয়-বিনয় করলো। কোনই ফল হোল না। আশপাশে কোনো বাড়ীঘর ছিলো না। রাস্তায় কাউকে দেখাও গেলো না।

দেখতে না দেখতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। রাত হোল। একেতো যন্ত্রণায় অস্থির। তার উপরে অন্ধকারের ভয়। প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড় হোল ভণ্ডুলের।

হঠাৎ একটা জোনাকী পোকোকে দেখা গেলো। জ্বলে জ্বলে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো সে। তাকে দেখে ভণ্ডুল বললো—

—ভাই জোনাকী, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারো? বড্ড কষ্ট পাচ্ছি আমি।

বেচারা জোনাকী তখন দয়াপরবশ হয়ে জবাব দিলো—

—কি করে ওই লোহার কলটায় আটকা পড়লে তুমি?

—সে আর বলো না ভাই। ভয়ানক খিদে পেয়েছিলো। তাই কয়েকটা আঙুর ফল খেতে এসে এই ক্ষেতের মধ্যে ঢুকেছিলাম। এখন আমার এই অবস্থা।

—আঙুর ফল কি তোমার?

—না। আমার হতে যাবে কেনো!

—তবে কে তোমাকে অন্যের ক্ষেতে ঢুকে আঙুর ফল খেতে বলেছে?

—বললামই তো! আমার খুব খিদে পেয়েছিলো।

—যতোই খিদে লাগুক। পরের জিনিস না বলে না কয়ে নিয়ে যাবার অধিকার তোমার নেই।

এবারে ভণ্ডুল কেঁদে ফেললো হাউ মাউ করে। বললো,

—সত্যি সত্যি বলছি। এরকম আর করবো না।

ঠিক এই সময় কার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। ক্ষেতের মালিক চুপিসারে দেখতে এসেছে কোনো শিয়াল তার কলে আটকা পড়েছে কি না।

মালিক এ:সেই আলো জ্বেলে দেখলো তার কলে শিয়ালের বদলে একটা ছেলে আট্‌কা পড়ে আছে। তখন খুবই বিস্মিত হোল সে।

—ওরে চোর! সেই মালিক বেচারা রেগে গেলো খুব। তুমিই তাহলে আমার মুরগীগুলো চুরি করেছো।

—না-না। আমি চুরি করিনি। আমি চোর নই। কেঁদে কেঁদে ভণ্ডুল চিৎকার করে উঠলো। আমি শুধু আঙুর ফল খেতেই এখানে ঢুকেছিলাম।

—যে ছেলে আঙুর চুরি করে সে মুরগীও চুরি করতে পারে। দাঁড়াও. এবার তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো। যাতে করে অনেক দিন তোমার মনে থাকে সেই ব্যবস্থাই করবো।

বলেই কল থেকে ছাড়িয়ে ওর পিছন থেকে একটা মেষ শাবকের মতো তাড়িয়ে সোজা বাড়ীতে নিয়ে গেলো। তারপর উঠানের মাঝ-খানে পুতুলকে মাটিতে ফেলে তার গলায় পা রেখে বললো—

—এখন দেরী হয়ে গেছে। আমি শু'তে যাচ্ছি। কাল সকালে তোমার বিচার হবে। আর হ্যাঁ, আজ আমার কুকুরটা মরে গেছে।



তার বদলে তুমিই আজ রাতে পাহারা দেবে।

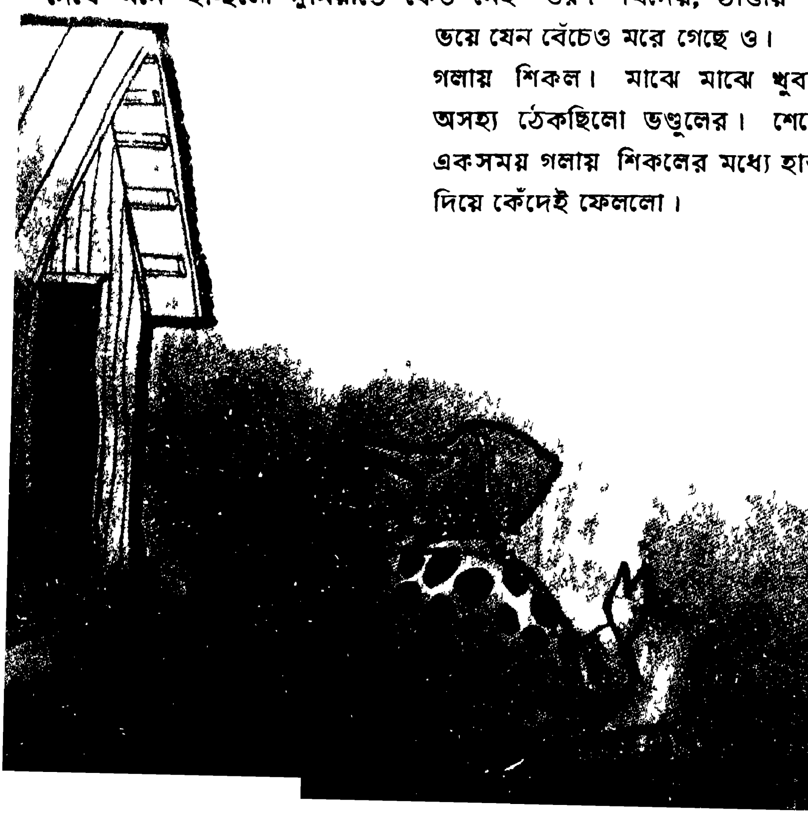
তারপর সেই চাষা লোকটা ভণ্ডুলের গলায় একটা দড়ি বেঁধে দিলো কুকুরের মতো করে। খুব শক্ত করেই বাঁধলো। যাতে করে খুলে না যায় অথবা কোনো রকমে মাথা গলিয়ে বেরিয়ে না যেতে পারে।

দড়িটা ছিলো কিন্তু একটা লম্বা লোহার শিকল। সেই শিকলটা নিয়ে একেবারে দেয়ালের সাথে বেঁধে দিলো চাষা। আর বললো,

—রাতে যদি বিষ্টি হয় তবে ওই কাঠের ঘরটার ভিতরে গিয়ে থাকতে পারো। বিচালি বিছানো রয়েছে ওখানে। চার বছর ধরে ওরই উপর আমার কুকুর ঘুমিয়ে এসেছে। ইচ্ছে করলে তুমিও ঘুমাতে পারো। আর হ্যাঁ, চোর এলে লক্ষ্য রেখো কিন্তু। দরকার হলে আমার কুকুরের মতোই ডাকাডাকি ক'রো।

এই শেষ কথা ক'টা বলে চাষা ঘরের মধ্যে চলে গেলো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিলো। আর এদিকে ভণ্ডুল উঠানের এক পাশে হাত-পা গুঁজে কোনো রকমে পড়ে রইলো। আহা, বেচারাকে দেখে মনে হচ্ছিলো দুনিয়াতে কেউ নেই ওর। খিদেয়, ঠাণ্ডায় ও ভয়ে যেন বেঁচেও মরে গেছে ও।

গলায় শিকল। মাঝে মাঝে খুবই অসহ্য ঠেকছিলো ভণ্ডুলের। শেষে একসময় গলায় শিকলের মধ্যে হাত দিয়ে কেঁদেই ফেললো।



—আর পারছি না। যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে আমার। ঠিক ফলই পেয়েছি আমি। অযথা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করলাম। দুষ্টু বন্ধুদের কথা মতো কাজ করলাম। তাইতো সর্বদা আমার পিছনে অনিষ্ট লেগেই রয়েছে। কতোই তো ভালো ভালো ছেলে আছে। আমি যদি তাদের একজন হতাম, পড়াশুনা ও কাজ কাম ঠিকভাবে করতাম, আর আমার বেচারা বাবার সাথে বাড়ীতেই থাকতাম—তাহলে আজকে আর আমাকে এই চাষার ঘরের সামান্য একটা পাহারার কুকুর হয়ে থাকতে হোত না। হায়, আর একটিবার যদি জন্ম নিতে পারতাম! কিন্তু সে পথও নেই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া, অধৈর্য হয়েও পড়েছি এখন।

তোমরা আবার অন্য কিছু ভেবে বসে থেকো না। এসব কথা ভণ্ডুলের খাঁটি প্রাণের কথা।

অবশেষে মনের দুঃখ মনেই চেপে পুতুল সেই ছোট ঘরটার ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

॥ বাইশ ॥

চুরি করতে এসে চোর ভণ্ডুলের হাতে ধরা পড়ে যায়।
পুতুল তার বিশ্বস্ততার জন্যে চাষার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

ভণ্ডুল ঘুমাচ্ছিলো। নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলো প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে। হঠাৎ মাঝরাতে কিসের একটা শব্দ এসে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলো।

একটানা ফিস-ফিস সে বিদঘুটে শব্দগুলো ভেসে আসছিলো উঠানের মাঝখান থেকে। কেমন যেন কানে এসে বিঁধছিলো পুতুলের। সে বিরক্ত হয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করে কুকুরের ঘরের দিকে তাকাতেই উঠানের দিকে নজর পড়লো। বিড়ালের মতো চারটে আশ্চর্য ধরনের পশু দেখতে পেলো সেখানে।

আসলে কিন্তু বিড়াল নয় তারা। শিয়াল।

শিয়ালগুলো মুরগী ও ডিম পছন্দ করতো খুব। তাদের ভিতর থেকে একটা শিয়াল বন্ধুদের কাছ ছেড়ে সেই কুকুরের আস্তানার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললো—

—সালাম বুলী ভাই !

—আমি বুলী নই। পুতুল উত্তর দিলো।

— তাহলে কে তুমি ?

—আমাকে একটা পাহারা-দার বলতে পারো।

—বুলী কোথায় ? যে বুড়ো কুকুরটা এখানে থাকতো সে কোথায় ?

—আজ সকালে মারা গেছে ।

—মারা গেছে ! আহ্, বেচারা পশু। অতি ভালো ছিলো সে। কিন্তু তোমার চেহারা দেখে মনে হয় তুমিও একটা ভালো কুকুরই হবে।

—মাফ করো। আমি কুকুর নই।

—তবে কে তুমি ?

—আমি একটা পুতুল।

—পাহারার কুকুর সেজেছো তো ?

—হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আমার পাওনা শাস্তি।

—আচ্ছা। তাহলে শোন—মৃত বুলীর সাথে আমার একটা চুক্তি ছিলো। তোমার সংগেও তা করতে চাই। তোমার কি মত ?

— কি চুক্তি করতে চাও বলো।

—আমরা সপ্তাহে একবার এখানে আসি। এভাবে চিরকালই আসছি মুরগীর ঘর দেখবার জন্যে। ওখান থেকে আজ আটটা মুরগী নিয়ে যাবো। এর থেকে সাতটা খাবো আমরা। আর বাকীটা তোমাকে দেবো। কিন্তু সাবধান, কোনোরকম সাড়াশব্দ কোর না। চুপ করে চোখ বুজে পড়ে থাকো। চাষা যেন জেগে না ওঠে।

—বুলী কি এরকমই করতো ?

—হ্যাঁ, তাই করতো। আমাদের মধ্যে কোনোদিন কোনো গোলযোগ হয়নি। তোমার কোনোই অসুবিধে হবে না। তুমি আরামে ঘুমাও আর সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা যাবার সময় তোমার ঘরের মধ্যে একটা মুরগী রেখে যাবো। তাতে তোমার সকালের খাওয়াটা চলে যাবে—বুঝেছো ?

হ্যাঁ, বুঝেছি। যথেষ্ট বুঝেছি। ভণ্ডুল উত্তর দিলো মাথা নেড়ে। কিন্তু মনে মনে বললো—দাঁড়াও একটু পরেই মজা দেখাচ্ছি।

এদিকে বিপদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই ভেবে সেই শিয়াল চারিটি

সোজা চলে গেলো মুরগীর ঘরের দিকে।

ঘরটা ছিলো কুকুরের ঘরের কাছেই। দাঁত আর নখ দিয়ে দরজাটা খুলে একে একে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো ওরা।

এদিকে ভণ্ডুল আগের থেকেই প্রস্তুত ছিলো। যেইনা ওরা ঢুকেছে অমনি বাইরের থেকে দরজা খট্ করে বন্ধ করে দিলো।

ভণ্ডুল শুধু দরজা বন্ধ করেই দিলো না, দরজার সামনে বড় একটা পাথর ঠেকিয়ে রাখলো। যাতে করে দরজা খুলে পালিয়ে যেতে না পারে ওরা। তারপর চেঁচাতে শুরু করে দিলো একটা পাহারার কুকুরের মতো—ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ।



চেঁচামেচিতে ঘুম থেকে জেগে উঠলো চাষা। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বন্দুকটা হাতে করে জানালা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলো—

—কি খবর—হয়েছে কি?

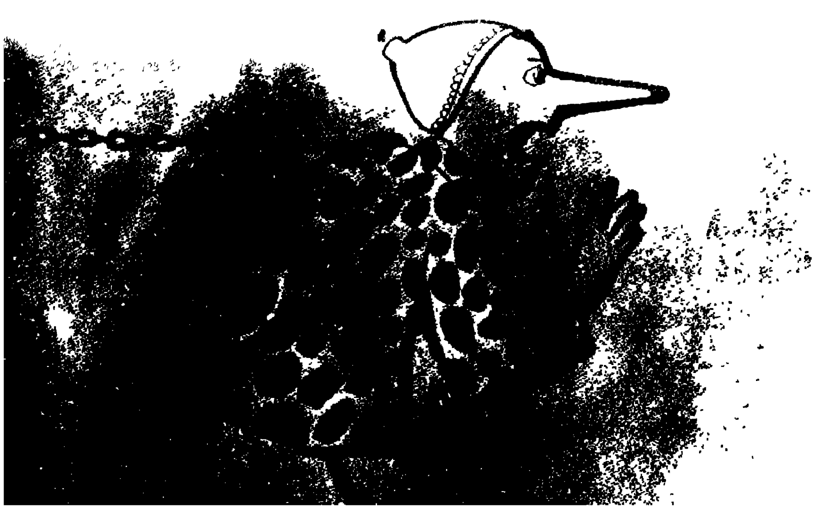
— চোর—চোর এসেছে। ভণ্ডুল উত্তর দিলো।

—কোথায়?

— মুরগীর ঘরে।

—দাঁড়াও, এক্ষুণি আসছি। বলে তক্ষুণি সে ছুটে গিয়ে মুরগীর ঘরের ভিতরে ঢুকলো। আর এক এক করে শিয়ালগুলো ধরে বড় একটা বস্তার মধ্যে পুরে ফেললো। তারপর আনন্দে বলে উঠলো—

—শেষ পর্যন্ত আমার হাতেই পড়লে তাহলে। এক্ষুণি শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু তা দেবো না। তোমাদের মতো আমি বিশ্বাস-



ঘাতক নই। কাল একটা খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে জীবিত অবস্থায় তেলেভাজা করবো। এইটেই তোমাদের ন্যায্য পাওনা। এর বেশী সম্মান পাবার যোগ্য নও তোমরা। আমরা মানুষরা দয়ালু ও উদার। তাই এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নজর দিই না।

এই ঘটনার পর চাষা ভণ্ডুলের কাছে এসে তাকে খুব আদর সোহাগ করলো। একথা সেকথার পরে জিজ্ঞেস করলো—

—এখন বলোতো, কেমন করে তুমি শিয়াল চারটিকে আট্‌কে রেখেছিলে? আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি—আমার একান্ত বিশ্বাসী বুলী এমনি কাজ কোনোদিনও করতে পারেনি।

পুতুল কিন্তু ইচ্ছে করলে তখন যা জানতো সব কিছুই বলে দিতে পারতো। কি কি সব লজ্জাকর চুক্তি হয়েছিলো কুকুর ও শিয়ালদের মধ্যে কিন্তু তা সে বললো না। ভণ্ডুল ভাবলো, কুকুর মরে গিয়েছে। অতএব মতের বিরুদ্ধে কথা বলে কি লাভ? মৃত মৃতই। যদি তাদের শান্তির জন্যে কিছু করা যায় বরং তা-ই ভালো। চাষা আবার জিজ্ঞেস করলো—

—ওরা যখন এলো তুমি ঘমিয়েছিলে, না জেগেছিলে?

—ঘুমিয়েছিলাম। ভণ্ডুল উত্তর দিলো। কিন্তু ওদের কথাবার্তার শব্দই আমাকে জাগিয়ে তুললো। চিন্তা করে দেখেন কতোখানি স্পর্ধা যে, ওদের একজন আমার কাছে এসে বললো—

—যদি তুমি চেঁচামেচি না করো এবং মালিককে ঘুম থেকে না তোলো তবে আমরা একটা মুরগী তোমাকে দিয়ে যাবো। বুঝেছেন? এমন ব্যবস্থা ওরা আমার সংগে করতে চেয়েছিলো। আমি একটা পুতুল। আমার অনেক দোষ-ত্রুটি রয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে অসৎদের ধামা কোনোদিনই ধরি না।

—চমৎকার! চমৎকার ছেলে তুমি। চাষা প্রায় চিৎকার করে উঠলো। আর পুতুলের কাঁধে হাত বুলাতে লাগলো। ভালো। এসব খুবই ভালো। আজ আমি যে কি খুশি হয়েছি তা বুঝবার জন্যে তোমাকে এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি।

যেমনি বলা তেমনি কাজ। চাষা তক্ষুণি ভণ্ডুলের গলা থেকে শিকল খুলে দিলো।

॥ তেইশ ॥

নীলকেশী সুন্দরী পরীর মৃত্যুশোকে পুতুল কাঁদতে থাকে। তারপর একটা কপোত এসে তাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে যায়। পুতুল তার বাবাকে রক্ষা করার জন্যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আর কি দাঁড়ায় ভণ্ডুল! ছাড়া পেয়ে ছুটতে শুরু করে দিলো একেবারে মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে। যে পর্যন্ত পরীর ঘরের দিক্‌কার সেই রাজপথটায় গিয়ে না উঠলো এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও দাঁড়া.লা না ও। রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে পূর্বদিকের সেই জংগলটার কাছে গিয়ে শেষে থামলো। এখানেই দেখা হয়েছিলো ওর বিড়াল ও নেকড়ে বাঘের সংগে।

সেই বড় আমগাছটার দিকেও নজর পড়লো। ওই গাছটাতেই ওকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিলো। আগেও যা ছিলো এখনো অবিকল তা-ই রয়েছে। একেবারে সব কিছুর সাথেই মিলে যাচ্ছে হুবহু। শুধু দেখা গেলো না ওর নীলকেশী পরী দিদির সেই সাদা ছোট্ট ঘরখানা।



বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো ভণ্ডুলের। ওর দিদির ঘরটা না দেখতে পেয়ে দুঃখ করলো খুব। দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলো। ঘরটা যেখানে ছিলো একেবারে সেখান পর্যন্ত গেলো।

কিন্তু ঘরের নামগন্ধও নেই। একটা পাথরের কবর রয়েছে সেখানে। কবরটার গায়ে লেখা হয়েছে—"নীলকেশী মেয়ে এখানে শুয়ে আছে। তাঁর ছোট ভাই ভণ্ডুল তাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়াই হোল তাঁর মৃত্যুর একমাত্র কারণ।"

কথাগুলো পড়ার সংগে সংগে ভণ্ডুল প্রথমটায় একেবারে পাথরের মতো হয়ে গেলো। পরে কবরের উপরে আছড়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে অজস্র চুমু খেতে লাগলো। এভাবে কেঁদেকেটেই কাটিয়ে দিলো সারাটা রাত।

সকাল। পুতুলের কান্নার রেশ থামেনি তখনো। আরো কাঁদলো, শেষ পর্যন্ত তার চোখে আর অশ্রু গড়ালো না। চিৎকারগুলো যেন জংগলের মধ্যে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে অসহায়ের মতো ফিরছিলো। পুতুল আক্ষেপ করে বলছিলো—

—ওগো আমার পরীদিদি! কেনো মরে গেলে তুমি? কেনো তোমার বদলে আমার মরণ হোল না? আমি তো দুষ্টু। তুমি তো কতো ভালো। এখন কে আমাকে বলে দেবে আমার বাবা কোথায়! ওগো আমার দিদি, বাবা কোথায় আমাকে বলো! শীগগীর করে বলো। তার সংগে আমি দেখা করতে চাই। তাকে ছেড়ে আর কোনোদিন কোথাও যাবো না। আমার দিদি গো, সত্যি করে বলো তো তুমি মরেছো? না মরোনি। মরতে পারো না কিছুতেই। আর যদি সত্যিই মরে থাকো এবং আমাকে ভালোবাসো তবে আবার জীবন্ত হয়ে ফিরে আসো। তুমি কি দেখতে পাওনা একে একে সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে? গুণ্ডারা যদি কোনো রকমে টের পেয়ে ফিরে আসে আমাকে মেরে ফেলে দেবে। আমি একা একা কি করতে পারবো এ জগতে? তুমি আর বাবা দু'জনকেই হারিয়েছি আমি। এখন কে আমাকে খেতে দেবে? রাতে ঘুমাবো কোথায়? আর নতুন জামা-কাপড়ই বা কে দেবে আমাকে? হায় হায়—এর চেয়ে আমার মরণই ছিলো ভালো।

এমনি করে কেঁদে-কেটে অনেক কিছুই বললো ভণ্ডুল। দিশাহারা হয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে গেলো। কিন্তু কাঠের চুল বলেই রক্ষে। ছেঁড়া সম্ভব হোল না।

সহসা মস্তবড় একটা পায়রা উড়তে উড়তে মাথার সোজাসুজি এসে দাঁড়ালো। আর পুতুলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো—

—ওহে বাচ্চা, কি করছো ওখানে?

ভণ্ডুল চোখের পানি মুছে তার দিকে মাথা তুলে বললো—

—দেখতে প চ্ছো না—কাঁদছি?

পায়রা বললো—

—আচ্ছা তোমার বন্ধুদের মধ্যে ভণ্ডুল নামের কোনো পুতুলকে চেনো?

—ভণ্ডুল? ভণ্ডুলের কথা বলছো? আমিই তো সেই ভণ্ডুল। এই কথা না শুনে পায়রা মাটিতে নেমে এলো।

সত্যিই পায়রাটা ছিলো ভীষণ বড়। সচরাচর এ ধরনের দেখাই যায় না। দেখতে শকুনের মতোই অনেকটা। পুতুলকে জিজ্ঞেস করলো—

—তাহলে, বাটুল মিয়া চেনো?

—বাপ্‌রে– সে যে আমার বাবা! কেনো, আমার কথা তোমাকে কিছু বলেছে নাকি? তাড়াতাড়ি করে আমাকে নিয়ে যাওনা তার কাছে।

—কিন্তু এখন তিনি কোথায় যে আছেন তাতো জানি না আমি। দিন তিনেক আগে সমুদ্রের তীরে রেখে এসেছিলাম তাকে।

—কি করছিলেন তিনি?

—একটা ছোট্ট নৌকা তৈরী করছিলেন সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে। আহা, চার মাস ধরে নাকি বেচারা তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। তোমাকে না পেয়ে শেষকালে স্থির করেছেন সমুদ্র পার হয়ে কোনো নতুন জগতে গিয়ে তোমাকে খুঁজে আনবেন।

পায়রার কথা শুনে ভণ্ডুল ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো—

—এখান থেকে সেই সমুদ্রের তীর কতো দূর?

—এই হাজার খানেক মাইল অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী হবে।

—হাজার মাইল? আহা, কতো ভালোই না হোত যদি তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারতে।

—যদি যেতে চাও যেতে পারো। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

—কেমন করে?

—আমার পিঠে করে। কেনো তোমার ওজন কি বেশী?

—ওজন? না, আমি একেবারেই হালকা।

আর কোনো কথা না বলে ভণ্ডুল পায়রার পিঠে গিয়ে চড়ে বসলো। ঘোড়সওয়ারের মতো এক পা একদিকে অন্য পা আরেক দিকে দিয়ে। তারপর বললো—

—চলো চলো আমার ঘোড়া। আমাকে জলদি করে নিয়ে চলো।

এদিকে দেখতে দেখতে পায়রা অনেক উপরে মেঘের কাছাকাছি গিয়ে পেঁাছালো। ভণ্ডুল নীচের দিকে চেয়ে ভয় পেলো খুব। আরো জোরে জড়িয়ে ধরলো পায়রাকে।

দিনভর উড়লো ওরা। সন্ধ্যের দিকে পায়রা বললো

—আমার খুব পিপাসা লেগেছে।

ভণ্ডুল বললো—

—আমার ভীষণ খিদে লেগেছে।

—তাহলে এখানেই দাঁড়াই, কি বলো? এখানে একটা পায়রার ঘর আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিই। তারপর আবার রওনা করে যাবো। কাল সকালের মধ্যেই যাতে সেই সমুদ্রের তীরে পেঁাছুতে পারি সে চেষ্টাই করতে হবে।

অতঃপর সেই পায়রার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ওরা। কিন্তু কাউকে দেখা গেলো না সেখানে। শুধু এক বালতি পানি আর একটা ব্যাগে কিছু ডাল পাওয়া গেলো।

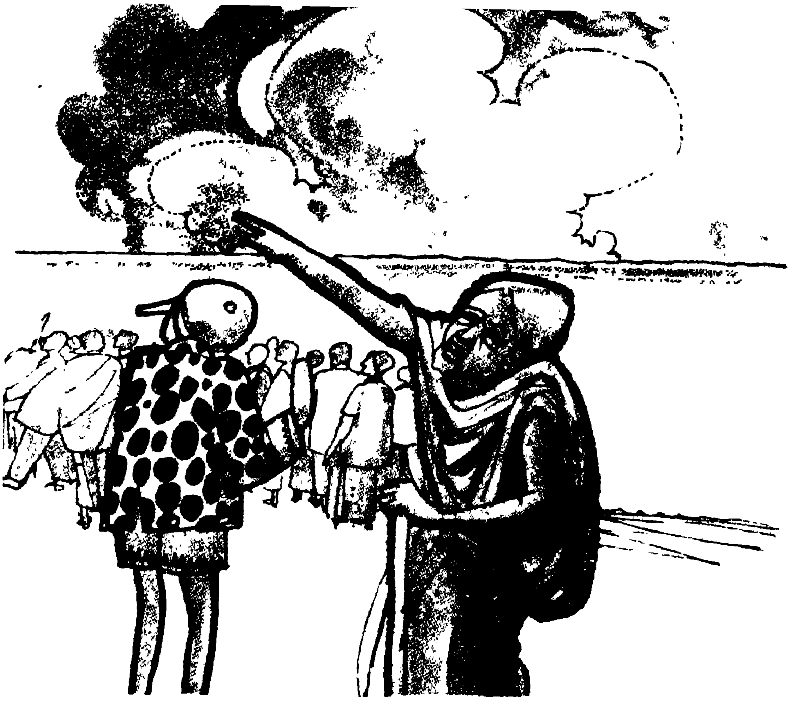
পুতুল ডাল মোটেই পছন্দ করতো না। তবুও খেতে লাগলো। খিদের জ্বালায় তখন সেগুলো কেমন যেন খুব ভালো লাগছিলো খেতে। পায়রার দিকে তাকিয়ে বললো—

—কোনোদিন ধারণাও করতে পারিনি ডাল এতো ভালো লাগে খেতে।

পায়রা উত্তর দিলো—

—আমার বাচ্চা, যখন সত্যিকারের খিদে লাগে ডালও ভালো লাগে তখন। খিদে কখনো কোনো রকম টালবাহানা মানে না।

ঝট্‌পট্‌ খেয়ে-দেয়ে আবার যাত্রা করলো ওরা। পরদিন সকালে সেই সমুদ্রের তীরে গিয়ে পেঁাছুলো। পায়রা ভণ্ডুলকে নামিয়ে রেখেই আবার চলে গেলো তক্ষুণি। ভণ্ডুল তাকে ধন্যবাদটুকু জানাতেও সময় পেলো না। পায়রাও তার উপকারের বিনিময়ে কোনো কিছু পাবার প্রয়োজন বোধ করলো না।



অনেক লোকজনেব ভিড় সেখানে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে করে হাত নেড়ে কি যেন বলছিলো সবাই। সেখানকার একটা বেটে গোছের বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলো ভণ্ডুল—

—কি হয়েছে এখানে?

—আর বলো না বাপু। এক বেচারা বাবা তার ছেলে হারিয়ে গেছে বলে ছোটো একটা নৌকা নিয়ে সমুদ্রের ওপারে খুঁজতে যাচ্ছিলো। দেখছো না কি ভীষণ তুফান! সেই ছোট নৌকাখানি ডুবে যাচ্ছে। তাই চেঁচামেচি করছে সবাই।

—কোথায় সেই নৌকা?

—ওই তো, ওই যে দেখো। ওই দূরে—আমার আংগুলের সোজাসুজি তাকাও। বুড়ী বললো। আর আংগুল দিয়ে সেই নৌকা দেখিয়ে দিলো। নৌকাটা এতো দূরে ছিলো যে একটা সুপুরির খোসার মতোই ভাসতে দেখা যাচ্ছিলো। তার ভিতরে বসে রয়েছে পুতুলের মতো ছোট্ট একটা মানুষ।

ভণ্ডুল সেদিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললো—

—ওই তো আমার বাবা। ওই তো আমার বাবা।

খুব ভীষণ অবস্থা তখন নৌকাটার। ঢেউয়ের দোলায় একবার উপরের দিকে একবার নীচের দিকে উঠানামা করছিলো। সময় সময় ঢেউয়ের আড়ালে ঢেকে যাচ্ছিলো।

এদিকে ভণ্ডুল তীর থেকেই তার বাবাকে ডাকতে লাগলো বারে বারে। হাতের ইশারায়, মাথার টুপি নেড়েও ডাকলো।

বাটুল মিয়া ভণ্ডুলকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হোল। কারণ, সে-ও মাথা থেকে টুপি খুলে ভণ্ডুলকে দেখাতে লাগলো। বাটুল মিয়ার সেই ইংগিত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিলো—সে আসতে চায়। কিন্তু উন্মত্ত সমুদ্রের ঢেউ তাকে আসতে দিচ্ছে না।

অকস্মাৎ প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো নৌকার উপরে। বাটুল মিয়া কোথায় উধাও হয়ে গেলো নৌকাশুদ্ধ।

উদ্‌গ্রীব হয়ে সবাই তাকিয়েছিলো সেদিকে। হয়তো একটু পরেই ভেসে উঠবে আবার। কিন্তু নৌকা আর দেখা গেলো না।

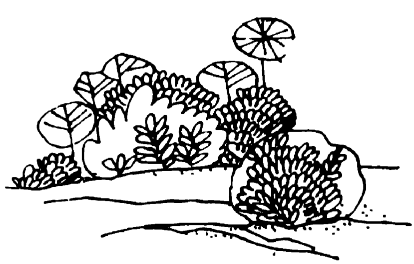
—বেচারা মানুষ! উপস্থিত জেলেরা বলে উঠলো। আর আফসোস করতে করতে চলে গেলো সবাই।

সহসা চিৎকার শুনে ফিরে তাকালো তারা। একটা ছেলেকে সমুদ্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেলো।—"আমার বাবাকে বাঁচাতে চাই" একথা বলে চেঁচাচ্ছিলো সে।

ভণ্ডুল কাঠের তৈরী বলে পানির উপরে ভাসতে লাগলো। কখনো কখনো পানির নীচে উধাও হয়ে যাচ্ছিলো। আবার কখনো ঢেউয়ের উপরে ভেসে উঠছিলো। কখনো বা শুধু একটা হাত অথবা একটা পা দেখা যেতে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে ভণ্ডুল তীর থেকে অনেক দূরে চলে গেলো। শেষে আর দেখাও গেলো না তাকে।

—বেচারা ছেলে! জেলেরা সবাই সহানুভূতি দেখিয়ে বললো। তারপর মনে মনে দোয়া করতে করতে যে যার বাড়ী ফিরে গেলো।



॥ চব্বিশ ॥

পরিশ্রমী মৌমাছির দ্বীপে গিয়ে পরীর সংগে ভণ্ডুলের নাটকীয়ভাবে দেখা হয়ে যায়।

বেচারা ভণ্ডুল তার বাবাকে সাহায্য করতে গিয়ে সারারাত ধরে সাঁতার কাটলো। কি ভয়ংকর রাত! একদিকে বিষ্টি ঝরছে। অপর দিকে শিলা পড়ছে অজস্র। আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দিনের মতো আলোকিত করে। অবশেষে সকাল বেলায় বেশ কিছুদূরে মাটির একটা সীমারেখা দেখতে পেলো ভণ্ডুল। আসলে সেটা ছিলো সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ। ভণ্ডুল যথাসাধ্য চেষ্টা করলো সেখানে পেঁছুতে। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে গেলো ওর। ঢেউয়ের দোলায় একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে দুলছিলো শুধু।

কপাল ভালো। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারলো ওকে। তীরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে পড়লো গিয়ে মাটিতে। শরীরের জোড়ায় জোড়ায় মড় মড় করে উঠলো সেই সাথে। তবুও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে মনে মনে বললো—

—উহ্, একটা মস্ত বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো। সূর্য তার সমস্ত গৌরব প্রকাশ করার সুযোগ পেলো। সমুদ্র যেন তেলের মতো শান্ত ও স্থির হয়ে গেলো। পুতুল তার ভিজে কাপড় চোপড় সব রোদে শুকাতে দিলো। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। সেই ছোট্ট নৌকাটার মধ্যে তার বাবাকে যদি দেখা যায় এই আশায় অনেকক্ষণ ভালো করে তাকালো, এদিক সেদিক। কিন্তু আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া কিছুই নজরে এলো না ভণ্ডুলের। শুধু নৌকার দু'একটা পাল বহুদূরে মৌমাছির মতো দেখা যাচ্ছিলো। মনে মনে ভাবলো—

—এই দ্বীপের নামটা যদি জানতে পারতাম। এখানে মানুষ আছে কিনা কে জানে। যদি থেকেই থাকে তারা সভ্য কিনা তা জানা দরকার। আবার এমন না হয় এখানে গুণ্ডাদের বসবাস। ছেলেদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেয় তারা। কিন্তু কই, কাউকেই তো দেখছি না! কার কাছেই বা জিজ্ঞেস করি?

আবার ভাবছে—হয়তো কেউ থাকেই না সেখানে। এসব দুশ্চিন্তায় ভণ্ডুল প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি।

ঠিক এই সময়ে কিছুদূরে একটা বিরাট আকারের মাছকে দেখা গেলো। তার মাথাটা পানির বাইরে। গোটা দেহটা স্থির হয়ে পানির উপরে ভেসে রয়েছে। কি নাম ধরে তাকে ডাকবে বুঝতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো পুতুল।

—এই যে মাছ সাহেব, একটা কথা বলবো?

—দুটোও বলতে পারো। মাছ উত্তর দিলো।

মাছটা ছিলো কিন্তু বোয়াল। খুব ভদ্র। সমুদ্রে ওরকম মাছ দেখা যায় না বড় একটা।

—দয়া করে বলতে পারেন এই দ্বীপে কোনো গ্রাম আছে কি না। যেখানে গেলে অন্ততপক্ষে কিছু খাওয়া যাবে। কিন্তু এমন না হয় খেতে গিয়ে আবার উল্টো আমাকেই খেয়ে ফেলে।

—নিশ্চয়ই আছে। বোয়াল মাছ উত্তর দিলো। এখান থেকে বেশী দূরেও নয়।

—কোন্ পথে যেতে হবে?

—ওই বাঁদিককার পথটা ধরো। আর নাক বরাবর এগিয়ে যাও। দেখো যেন ভুল না হয়।

—আমার আরেকটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

—বলো।

—তুমি তো সারা দিনরাত এই সমুদ্রের এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছো। কখনো কি কোনো ছোট নৌকার মধ্যে আমার বাবাকে দেখেছো?

—কে তোমার বাবা?

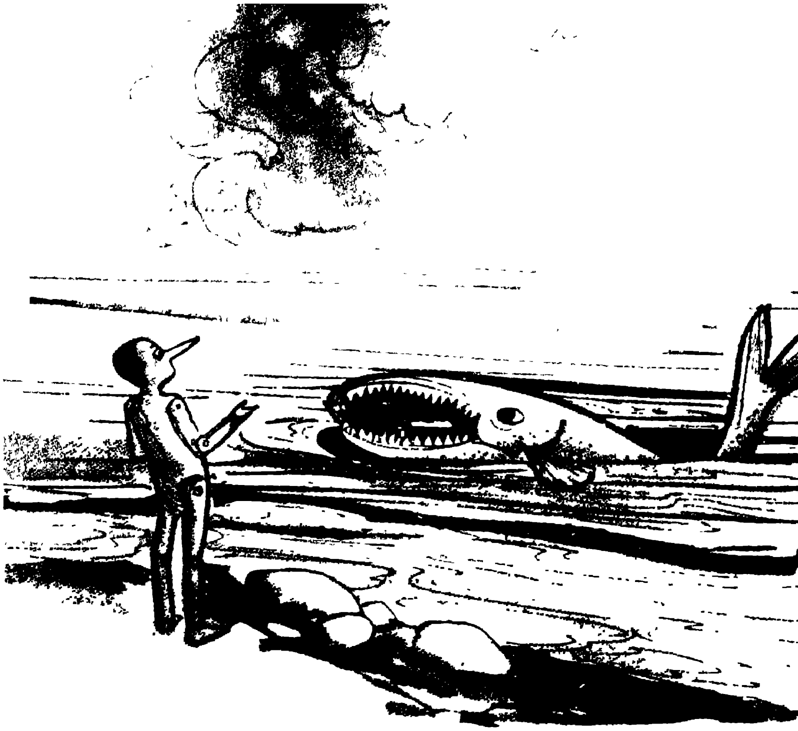
—পৃথিবীর বাবাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে বাবা। আর ছেলেদের মধ্যে যে সবার চেয়ে দুষ্টু সে-ই হলাম আমি।

বোয়াল মাছ বললো—

—গত রাতের ভয়ংকর ঝড়ে সে নৌকা ডুবে গেছে।

—আর আমার বাবা?

—কয়েক দিন ধরে প্রকাণ্ড একটা হাঙর মাছ এসেছে এখানে। নিশ্চয়ই তোমার বাবাকে সে খেয়ে ফেলেছে।



ভণ্ডুল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার জিজ্ঞেস করলো—

—সেই হাঙর মাছটা সত্যিই কি প্রকাণ্ড?

—সত্যিই প্রকাণ্ড। বোয়ালমাছ বললো। একটা পাঁচতলা দালানের সমান হবে। বিশাল তার মুখ। একটা ট্রেন যাবতীয় গাড়ীসহ অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারে।

—বাপরে বাপ! চমকে উঠলো পুতুল। আর তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে আবার বললো—সালাম। বোয়াল মাছ সাহেব, আপনার খবরের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।—তারপর, দ্রুত সেই বাঁ পথ ধরে এগিয়ে চললো পুতুল।

চলছে, চলছে—হঠাৎ এক আধটুকু শব্দ পেলেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে ভণ্ডুল। ভেবেছে সেই হাঙর মাছের কথা। পাঁচতলা দালানের মতো যার প্রকাণ্ড দেহ; যার বিরাট মুখের ভিতর দিয়ে ট্রেন চলাচল করতে পারে সেই ভয়ংকর মাছটা বুঝি পিছু লেগেছে ওর।

হেঁটে হেঁটে প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছালো ভণ্ডুল। গ্রামটার নাম—"শ্রমিক মৌমাছির গ্রাম"।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। অনেকেই সেদিকে চলাফেরা করছিলো। সবাই নিজের জন্যে ব্যস্ত। যে যার কাজ করে চলেছিলো সবাই। যে কোনো কাজই করতো তারা। তাদের মধ্যে কোনো আলসে অথবা ভিক্ষুক ছিলো না বললেই চলে।

—বুঝেছি। অলস ভণ্ডুল বললো। এই গ্রাম আমার জন্যে নয়। কাজ কাম করবার জন্যে জন্মিনি আমি।

এদিকে কিন্তু ভণ্ডুলের খিদেও লগেছে খুব। লাগবার কথাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে দানাপানি পড়েনি কিছুই। সামান্য একটু ডাল পর্যন্তও না।

কি করা যায় এখন? কেমন করে দুটো খেয়ে বেঁচে থাকা যায়? অবশ্য দু'টি পথ খোলা রয়েছে। হয় কাজ কাম করে কিছু রোজগার করে খাওয়া, নতুবা ভিক্ষাবৃত্তি করা।

ওদিকে ভিক্ষা করতেও লজ্জা লাগছিলো খুব। কারণ, ভিক্ষা করতে ওর বাবাই বারণ করে দিয়েছিলো ওকে। বাবা বলেছিলো -যারা বুড়ো এবং অসুস্থ তারা ভিন্ন অন্য কাউকেই ভিক্ষা করা উচিত নয়। এ জগতে প্রকৃত গরীব তারাই যারা অধিক বয়স হেতু অথবা রোগের জন্যে নিজের হাতে কাজ কাম করে খেতে পারে না। এধরনের লোক ছাড়া অন্য সবাইকে কাজ কাম করা একান্ত কর্তব্য। যদি তারা কাজ না করে উপবাস থাকে, থাকুক। কারুর সাহায্য না পাওয়াই ভালো তার পক্ষে। বুঝুক আলসেমির কি মজা।

তক্ষুণি সেই রাস্তা দিয়ে কে একজন যাচ্ছিলো। তার সারা গা বেয়ে ঘাম পড়ছিলো দরদর করে। খুবই পরিশ্রমের কাজ করতো সে। কয়লা বোঝাই দুটো গাড়ী টেনে নিয়ে বেড়াতো।

চেহারা দেখে তাকে খুবই ভালো লাগলো ভণ্ডুলের। তার কাছে গিয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বললো—দয়া করে একটা পয়সা দেবেন আমাকে? খিদের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরে গেলাম।

সেই মানুষটি তখন উত্তর দিলো—

শুধু একটা কেনো চার পয়সাও দিতে পারি তোমাকে। তবে কাজ করতে হবে একটা। আমার এই কয়লা বোঝাই গাড়ী দুটোকে টানতে সাহায্য করতে হবে আমাকে। বলো পারবে?

পুতুল একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিলো—

—আপনার জানা উচিত ছিলো আমি কোনো গাধা নই। কোনদিন কোনো গাড়ীও টানিনি আমি।

লোকটি ওর কথায় একটু রেগে বললো—

—চমৎকার ছেলে তুমি! সত্যিই যদি খিদেয় মরে যাচ্ছো তবে তোমার অহংকারগুলিই খেয়ে ফেলো না কেনো। কিন্তু সাবধান, বুঝে শুনে খেও। যেন আবার হজম করতে পারো।



কিছুক্ষণ পর আবার এক রাজ-মিস্ত্রির সাথে পুতুলের দেখা। সে ওই পথ ধরেই যাচ্ছিলো। তার কাঁধে ছিলো চুনশুদ্ধ একটা বস্তা। ভণ্ডুল তাকে বললো—

—আচ্ছা ভাই, এই অসহায় ছেলেকে দয়াকরে একটা পয়সা দেবেন? খিদের জ্বালায় শুধু হাই তুলেই কাটাচ্ছি।

রাজমিস্ত্রি উত্তর দিলো—

—নিশ্চয়ই দেবো। চুনের এই বস্তাটা বয়ে নিয়ে চলো আমার সংগে। এক পয়সা কেনো, পাঁচ পয়সাও দিতে রাজী।

ভণ্ডুল বললো—

—কিন্তু চুন যে ভীষণ ভারী। তাছাড়া, আমি পরিশ্রম করতে চাই না।

—বেশ তো যদি পরিশ্রমই না করতে চাও তবে হাই তুলে আনন্দ করতে থাকো গিয়ে। সেইটেই তোমার পক্ষে ভালো হবে।

এমনি করে মিনিট তিরিশেকের মধ্যে প্রায় কুড়ি জনের সাথে দেখা হোল ভণ্ডুলের। তাদের কাছে চাইলো কিছু। কিন্তু সবার কথাই এক। বললো,

—লজ্জা হয় না তোমার? ভিক্ষা ছেড়ে দিয়ে বরং একটা কাজ টাজ ধরো। নিজের পরিশ্রমে রোজগার করে খেতে শেখো।

অবশেষে দেখা হোল একটা মেয়ের সংগে। দেখে মেয়েটাকে খুব ভালো বলেই মনে হোল। কলসি কাঁখে হেঁটে যাচ্ছিলো সেখান দিয়ে। ভণ্ডুলের তখন দারুণ পিপাসা লেগেছে। বললো,—এই যে বোন, আপনার কলসি থেকে একটু পানি দেবেন খেতে? মেয়েটি ওর দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো—

—আচ্ছা ভাই নাও, খাও।

ভণ্ডুল পানি খেয়ে মুখ মুছে আস্তে করে বললো—

—পিপাসাতো গেলো। এখন খিদেটা দূর করতে পারলে হোত। কথাটা শুনে মেয়েটা একটু হেসে বললো—

—যদি এই কলসিটা আমার ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাও তবে আমি তোমাকে ভালো দেখে একটা পাউরুটি খেতে দেবো।

ভণ্ডুল তখন কলসির দিকে তাকালো শুধু। 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বললো না কিছুই। তাই দেখে সেই মেয়েটি আবার বললো—

—পাউরুটি তো দেবোই। তার সংগে ভাত আর তরকারিও খেতে দেবো। ভণ্ডুল আরেকবার সেই কলসির দিকে নজর বুলালো। আর এবারেও আগের মতোই চুপ করে রইলো সে।

—ভাত খাবার পরে মিষ্টিও খেতে দেবো তোমাকে।

ভণ্ডুল আর লোভ সামলাতে পারলো না। বললো,

—যাহোক, কলসি তোমার বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যাবো। কিন্তু সব কথা যেন ঠিক থাকে।

এই বলে ভণ্ডুল কলসিটি মাথায় তুলে নিলো। বেশ একটু ভারী ছিলো কলসিটা। তাই হাতে করে না নিতে পেরে মাথায় তুলে নিয়েছিলো।

একটু পরেই বাড়ী গিয়ে পৌঁছালো ওরা। মেয়েটি ভণ্ডুলকে নিয়ে একটা সুন্দর টেবিলের সামনে বসালো। তাকে পেটপুরে রুটি, ভাত-তরকারি ও মিষ্টি খেতে দিলো।

ভণ্ডুল খেলো। কিন্তু তাকে খাওয়া বলা চলে না। গোগ্রাসে গিলছিলো শুধু। মনে হচ্ছিলো ভণ্ডুলের পেট নয়, যেন একটা গুদাম।

ধীরে ধীরে যখন ভণ্ডুলের পেটের জ্বালা নিবে গেলো তখন মাথাতুলে





তার উপকারিণীকে ধন্যবাদ জানাতে গেলো। কিন্তু সেই মেয়েটির দিকে নজর পড়তেই কেমন যেন হয়ে গেলো সে। একেবারে হা করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তাকে দেখেই যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে। ভীষণ চাউনি তার। হাত দুটো উপরের দিকে স্থির হয়ে আছে। মুখটা এমনভাবে খুলে রয়েছে যে মুখের ভিতরকার সেই রুটি আর ভাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো সব। তাই দেখে মেয়েটি হেসে বললো—

—আশ্চর্য হয়ে দেখছো কি ?

ভণ্ডুল থোত্‌লাতে থোত্‌লাতে উত্তর দিলো—

—মনে হয়—মনে হয়—তোমার মুখ, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চোখ, সব কিছুই যেন আমার সেই পরীদিদির মতো। অবিকল সেই পরীদিদি তুমি। সত্যি করে বলোতো—তুমিই কি আমার সেই পরীদিদি ? আমাকে আর কষ্ট দিও না। জলদি করে বলো। আমি অনেক কেঁদেছি, অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। দুঃখ কষ্ট পেয়েছি প্রচুর।

এই কথাগুলো বলে কেঁদে কেঁদে ভণ্ডুল একেবারে সেই মেয়েটির পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

।। পঁচিশ ।।

ভণ্ডুল একটা ভালোছেলে হবে এবং ভালোভাবে পড়াশুনা করবে বলে পরীর কাছে শপথ করে। কারণ, সে আর পুতুল থাকতে চায় না। আর সব ভালো ছেলেদের মতো হ'তে চায়।

প্রথমে সেই সুন্দরী মেয়েটি জানালো - সে নীলকেশী পরী নয়। কিন্তু ভণ্ডুল তাকে চিনতে পেরেছে একথা টের পেয়ে নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না। পুতুলকে বললো—

—দুষ্টু কোথাকার ! কেমন করে আমাকে চিনতে পারলে ?

—তোমার প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা আছে বলেই চিনতে পেরেছি।

—মনে আছে সেই কথা ? সেই যে তোমার সংগে আমার পরিচয় হয়েছিলো তখন কতোটুকু ছিলাম আমি ! কতোটুকু দেখেছো আমাকে ?

এখন একজন বয়সী স্ত্রীলোকের মতো হয়ে গেছি—তাই না? এখন থেকে আমি তোমার মা।

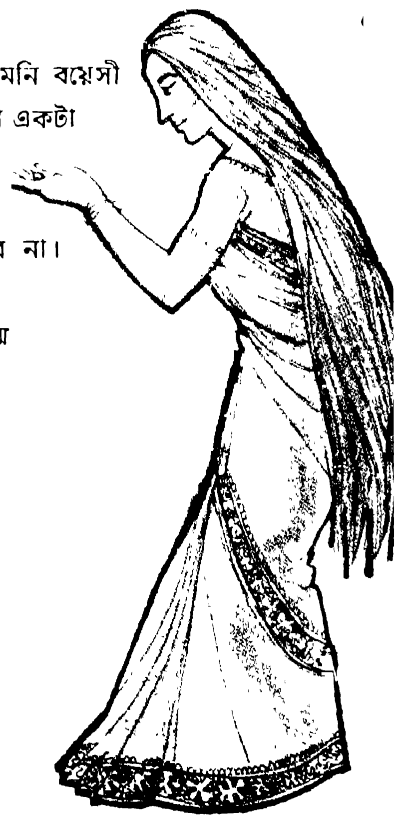
—চমৎকার! তা'হলে এখন থেকে আর বোন বলে ডাকবো না তোমাকে। মা বলেই ডাকবো কিন্তু। বলো রাজী?

—বললামই তো। তাই ডেকো।

—আহ, অনেকদিন ধরেই আর আর ছেলেদের মতো মা বলে ডাকবার বড় সখ ছিলো আমার। আজ তা পূরণ করলে তুমি। কিন্তু কেমন করে এতো তাড়াতাড়ি বুড়ী হয়ে গেলে? আমি যে বুঝতে পারছি না কিছুই।

—অবশ্য রহস্য একটা আছে।

—আমাকে বলো না মা। আমিও যে অমনি বয়েসী হ'তে চাই। এই দেখো না—চিরকালটা একটা ইঁদুরের মতো ছোটই রয়ে গেলাম।



পরী বললো—

—কিন্তু তুমি যে কখনোই বড় হ'তে পারবে না।

—কেনো?

—পুতুলরা বড় হতে পারে না। ওরা জন্মে পুতুল। সারা জীবনটাই পুতুল হয়ে কাটে। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পুতুলই থেকে যায়।

—কিন্তু হায় হায়। আমি যে সারা-জীবনটাই পুতুল হয়ে কাটাতে চাই না। ভণ্ডুল চেঁচিয়ে বলে উঠলো। অন্যসব ছেলেদের মতো আমিও মানুষ হতে চাই।

—উপযুক্ত হলে নিশ্চয়ই হবে।

—সত্যিই? আমি কি উপযুক্ত হতে পারবো?

—খুব পারবে। আগে ভালোছেলে হও!

—কেনো, আমি বুঝি ভালোছেলে নই !

—না-না তাই বলেছি নাকি! ভালোছেলেরা সব সময়ই বাধ্য থাকে। কিন্তু তুমি....... .

—আমি অবাধ্য বুঝি ?

—ভালোছেলেরা পড়াশুনা ভালোবাসে। কাজ কাম করতে চায়। কিন্তু তুমি ....

—আমি বুঝি অলস ? আর পড়াশুনা না করে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই !

—ভালোছেলেরা সব সময় সত্য কথা বলে।

—আর আমি বুঝি সব সময় মিথ্যা কথা বলি ?

—ভালোছেলেদের-ইস্‌কুলে যেতে ভালো লাগে।

—আর আমার বুঝি ইস্‌কুলের কথা শুনলে মাথা ধরে। সে যাক— আজ থেকে আমার জীবনটা পরিবর্তন করতে চাই।

—তুমি সত্যি করে বলছো ?

—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। একেবারেই একটা ভলোছেলে হতে চাই আমি। আমার বাবাকে খুশি করতে চাই। আহা, আমার বাবা না জানি এখন কোথায়! তুমি কি তার খবর জানো ?



—আমি কি করে জানবো !

—আমার ভাগ্যে বুঝি তার সাথে দেখা আর হবে না। আর আগের মতো তাকে জড়িয়ে ধরতে পারবো না আমি।

—পারবে, পারবে। আমি নিশ্চিত তার দেখা তুমি পাবেই।

অমনি জবাব পেয়ে ভণ্ডুল যেন খুশি হতে পারলো না। সে পরীর হাতে চুমু খেলো কয়টা। অতঃপর স্নেহ কুড়াতে গিয়ে মুখ তুলে বললো—

—আমাকে বলো তো মা তুমি কি সত্যি সত্যিই মরে গিয়েছিলে ?

—ওরে পাগল—না। হেসে উত্তর দিলো পরী।

—উহ্‌, কবরের গায়ে লেখাগুলো পড়ে আমি কি কান্নাটাই না কেঁদে ছিলাম—তা যদি দেখতে তুমি।

—জানি। তা আমি জানি বাছা। আর এই জন্যেই তো আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। তুমি যে একটা ভালোছেলে তা তোমার দুঃখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি। ভালোছেলেরা দুষ্টুমি করলেও তাদের কাছ থেকে অনেই কিছুই আশা করা যায়। তাদের ভালো পথে নিয়ে যেতে কষ্ট হয় না। আমি এখন পর্যন্ত শুধু তোমাকে খুঁজতেই এসেছি। আমি যে তোমার মা। ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারে কখনো?

—বাহ্‌রে কি মজা- -কি মজা! ভণ্ডুল আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো।

—আজ থেকে আমার সব কথাই শুনতে হবে তোমাকে। আর যা করতে বলি তা-ই করবে!

—নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

পরী আবার বললো—

—কাল থেকে তুমি ইস্‌কুলে যাবে।

ইস্‌কুলের কথাটা শুনেই ভণ্ডুলের আনন্দে যেন ভাটা পড়ে গেলো একটু।

—পড়াশুনা করে বড় হয়ে ভালো দেখে একটা কাজ অথবা চাকরি

এবার ভণ্ডুলের মুখে আর আনন্দই রইলো না। তাই দেখে পরী একটু দুঃখ করে জিজ্ঞেস করলো—

—তোমার মুখ কালো কেনো?

—আমার মনে হয় ইস্‌কুলে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে না এখন। ইস্‌কুলের বয়স পার হয়ে গেছে অনেক আগেই।—মিন মিন করে জবাব দিলো পুতুল।

—না-না-না। মনে রেখো, শিক্ষার কাছে কোনোদিন কেউ বুড়ো হয় না।

—কিন্তু কাজ-কাম অথবা চাকরী-বাকরী এ দুটোর কোনোটাই পছন্দ করি না আমি।

—কেনো?

—কাজ-কাম করতে গেলে ভয়ানক পরিশ্রম করতে হয়।

পরী বললো—

—বাছা, যারা এসব কথা বলে তাদের জন্যে অবশ্যই—হয় হাসপাতাল, নতুবা কারাগার। জেনে রেখো, মানুষ সে তা যতোই গরীব হোক আর বড়লোক হোক; এ সংসারে কাটাতে গেলে কোনো না কোনো কাজকাম করতেই হবে। সাবধান, ভুলেও অলসতা যেন জীবনে না ঢোকে। আলসেমি খুব খারাপ রোগ। শৈশব থেকেই যথাসম্ভব এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। তা না হলে বড় হওয়া আর সম্ভব নয়।

কথাগুলো ভণ্ডুলের হৃদয়কে কাঁটার মতো খোঁচাতে লাগলো। মুখ তুলে পরীকে বললো—

—আমি পড়বো। আমি কাজ করবো। আর যা তুমি বলবে তা-ই-শুনবো। পুতুলের জীবন আর ভালো লাগে না আমার। আমি সত্যি-কারের একটা ভালোছেলে হতে চাই। তুমিই তো প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে! বলো, বলোনি?

—হ্যাঁ, বলেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেই বলেছিলাম। কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করছে এখন তোমার উপর।

।। ছাব্বিশ ।।

মস্তবড় একটা মাছের খবর পেয়ে তা দেখবার জন্যে ভণ্ডুল তার ইসকুল-বন্ধুদের সংগে সমুদ্রের তীরে যায়।

পরদিন ভণ্ডুল ইসকুলে গেলো।

একটা পুতুলকে পাঠশালায় দেখে সেখানকার দুষ্টছেলেরা হাসাহাসি করতে লাগলো সবাই। কেউ টিটকারি আর ঠাট্টা করে নানারকম কথা বলছিলো। আবার কেউবা হাত ধরে টানাটানি করছিলো। আবার কেউবা তার টুপি, জামা-কাপড় ইত্যাদি কেড়ে নিচ্ছিল। কেউ কেউ কালি দিয়ে নাকের নীচে গোঁফ তৈরী করে দিচ্ছিলো। আবার কেউ কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে পুতুলকে নাচাতে চাইছিলো।

ভণ্ডুলের মুখে কথা নেই। প্রথমে চুপচাপ রইলো কিছুক্ষণ। কিন্তু আর পরে সহ্য করতে না পেরে মুখ কালো করে বললো—

—ভাইসব সাবধান! আমি ঠাট্টার পাত্র হতে এখানে আসিনি। আমি যে সম্মান দিচ্ছি, তোমাদের কাছ থেকেও তা পেতে আশা করি।



—চমৎকার! একটা ছাপা বইয়ের মতোই কথা বলেছো বাছাধন। দুষ্টু ছেলেরা এক সংগে বলে উঠলো সবাই।

ছেলেদের মধ্যে একজনের মাথায় একটা সুন্দর বুদ্ধি এল। হাত বাড়িয়ে দিলো পুতুলের নাক ধরবার জন্যে। কিন্তু সে বেচারা সুযোগ করে উঠতে পারলো না। তার আগেই ভণ্ডুল বিদ্যুৎবেগে একটা লাথি মেরে বসলো।

—হায় হায়, কি ভীষণ শক্ত পা বাবা! ছেলেটি তার পা মালিশ করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলো।

—উহ্; কি শক্তই না কনুইটা। আরেকজন বলে উঠলো। কারণ, ভণ্ডুল তার পেটে কনুইয়ের গুঁতো মেরেছিলো নিতান্ত ঠাট্টা করেই। কাজেই লাথি আর কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ওরা দমে গেলো অনেকটা। সবাই ভণ্ডুলকে আদর করতে শুরু করে দিলো। ভালোবাসতে লাগলো খুব।

শিক্ষকরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পড়াশুনায় খুবই ভালো ভণ্ডুল। সবার আগে ইসকুলে আসে। আর সবশেষে বেঞ্চ ছেড়ে চলে যায়।

কিন্তু দোষ একটা ছিলো। অনেক ছেলেদের সাথে মেলামেশা করতো সে। এদের একটি ছেলে ছিলো ভয়ানক দুষ্টু। সবাই চিনতো তাকে। পড়াশুনা করতে চাইতো না মোটেই।

শিক্ষকরা সাবধান করে দিতেন ভণ্ডুলকে। যেন কখনো ওই দুষ্টুছেলে-টার সাথে মেলমেশা না করে। পরীও বারে বারে সতর্ক করে দিয়ে বলতো—

—সাবধান ভণ্ডুল, সাবধান! দুষ্টু ছেলেদের সংগে মিশে চললে পড়াশুনা হয় না। বরং বড় বড় বিপদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

—কেনো বিপদ নেই। পুতুল বেপরোয়া হয়ে জবাব দিলো। তারপর কপালে আঙুল ঠেকিয়ে আবার বললো—এর ভিতরে অনেক বুদ্ধি রয়েছে।

একদিন এক ঘটনা ঘটে গেলো। ইসকুলের ছেলেদের সংগে দেখা হলে তারা বললো—

--খবর শুনেছ ভণ্ডুল?

--কই না-তো? কিসের খবর?

--কাছেই সাগরে নাকি পাহাড়ের মতো মস্তবড় একটা মাছ দেখা গেছে।



—সত্যিই ?

—হ্যাঁ।

—কি জানি, তাহলে হয়তো সেই মাছটাই হবে।

—কোন্ মাছ ?

—বাবা যেদিন ডুবে গেলেন সমুদ্রে—সেদিন দেখা হয়েছিলো এমন একটা মাছের সংগে। সম্ভবত সেইটাই।

—আমরা দেখতে যাচ্ছি সেখানে। তুমি কি যাবে আমাদের সংগে ?

—না, যাবো না। আমাকে ইসকুলে যেতে হবে।

—ইসকুলে তোমার কি ? চলো যাই। ইসকুলে কাল যেও। ইসকুলতো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না! একদিন কম অথবা বেশী গেলে কি এসে যায় ? আমরা তো চিরটাকাল এমনি গাধা হয়েই থাকবো।



—না তা হয় না। তাহলে মাস্টার সাহেব কি বলবেন!

—বলুকগে মাস্টার সাহেব। তাকে বকাবকি করতেই হয়। এজন্যেই তো সে মাইনে পায়।

—আর আমার মা ?

—ও মা'র কথা বলেছো? সব মায়েরাই কিছু জানে না। সেই দুষ্টু ছেলেরা উত্তর দিলো।

ভণ্ডুল বললো—

—কি করি বলো? মাছটা দেখতে যে ইচ্ছে না হয় তা নয়। কিন্তু ইসকুল কামাই যাবে যে! বরং ইসকুলের পরেই যাবো।

—গাধা কোথাকার! তুমি ভেবেছো সেই পর্যন্ত মাছ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে? ক্লান্ত হলেই চলে যাবে সে। আর যদি গেছে তো গেছেই!

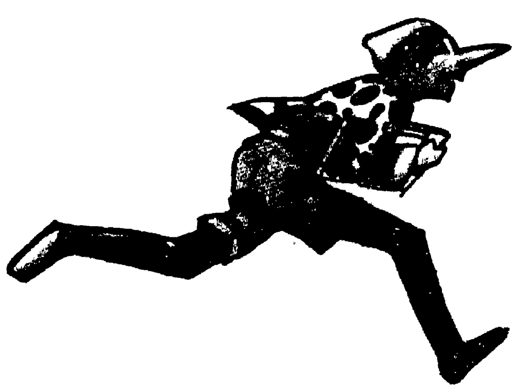
—আচ্ছা, এখান থেকে কতোদূর সেই সমুদ্রের তীর? কতো সময় লাগবে সেখাতে যেতে?

—তেমন দূর আর কোথায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গিয়ে আবার ফিরেও আসা যাবে।

—বেশ তো চলো যাই। দেখি কে আগে যেতে পারে। ভণ্ডুল হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো। আর সংগে সংগে সবাই মিলে বই বগল-দাবা করে মাঠ-ঘাটের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটতে লাগলো।

সবার আগে আগেই যাচ্ছিলো ভণ্ডুল। সবার পায়েই যেন পাখা লাগানো! মাঝে মাঝে পিছনের দিকে তাকিয়ে বন্ধুদের অনেক পিছিয়ে পড়তে দেখে ঠাট্টা করে চলছিলো।

বোকা পুতুলটি যে কি ভয়ানক বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো তা সে টের পেলো না।



॥ সাতাশ ॥

ভণ্ডুল এবং তার বন্ধুদের মধ্যে ছোট খাট যুদ্ধ বেঁধে যায়। একজন আহত হয়। ভণ্ডুল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

ভণ্ডুল সমুদ্রের তীরে এসেই চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগলো। কিন্তু কোথাও কোনো মাছ দেখতে পেলো না।

বেশ শান্তই ছিলো সমুদ্র। আয়নার মতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো সব। বন্ধুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো—

—মাছ কোথায় ?

ছেলেদের মধ্যে একজন হেসে উত্তর দিলো।

—খুব সম্ভব খেতে গেছে।

আর একজন হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো,

—বোধ হয় ঘুমাতে গেছে।

এসব জবাবে ভণ্ডুল মনে মনে রেগে গেলো। বুঝাতে পারলো বন্ধুরা তার সাথে চালাকি শুরু করে দিয়েছে। একটু কড়া সুরেই বললো—

—এখন কি হবে ? আমাকে এইভাবে ঠকিয়ে কি লাভ হয়েছে তোমাদের ?

—লাভ হয়েছে বৈ কি। নিশ্চয়ই হয়েছে। সবাই একসাথে উত্তর দিলো ?

—কি লাভ ?

—ইসকুল থেকে ফিরিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে এলাম ; এটাই কি কম লাভ ?

—রোজ রোজ রীতিমতো ইসকুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে লজ্জা করে না তোমার ? অতো বই পড়লে তো লজ্জা হবার কথা।

—আমি যদি পড়ি তোমাদের কি ? কি এসে যায় তোমাদের ?

—অনেক কিছুই এসে যায়। মাস্টারের কাছে তোমার মতো ভালো হ'তে পারি না আমরা।

—কেনো ?

—তুমি বেশী পড়াশুনা করো বলে। আমরা যারা পড়াশুনা করছি না তাদের রীতিমতো অপমান করছো তুমি। এটা খুবই খারাপ কথা। দেখো ভণ্ডুল, আমাদের মান সম্ভ্রম বলে একটা কিছু আছে। যেভাবেই হোক তাকে রক্ষা করবোই আমরা।

—তা'হলে তোমাদের খুশি করতে গিয়ে কি করতে হবে আমাকে ?

—আমাদের তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে তোমাকে।

—ওরা কারা ?

—ইসকুল, পড়াশুনা, আর মাস্টার সাহেবরা।

—আর যদি আমি ঠিকভাবে পড়াশুনা করে যাই ?

—তা'হলে তোমার সংগে আমাদের আঁড়ি। আর কোনদিন কথা বলবো না। বরং সুযোগ পেলে উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

পুতুল মাথা দুলিয়ে বললো—

—সত্যিই হাসি লাগছে আমার।

—ভণ্ডুল সাবধান! ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলেটি পুতুলের সামনে দাঁড়িয়ে বললো। এমন স্পর্ধা আমরা সহ্য করতে পারি না। যদি তুমি আমাদের ভয় না করো আমরাও ভয় করবো না তোমাকে। মনে রেখো, তুমি একা। আর আমরা হলাম গিয়ে সাতজন।

আর হাসি থামাতে পারলো না ভণ্ডুল। হেসে হেসেই বললো—

—সাতজন এক একটা মারাত্মক পাপের মতো, তাই না ?

—আচ্ছা। সাহস তো দেখছি কম নয় তোমার! সবাইকে অপমান করলে তুমি? মারাত্মক পাপের নামে অভিহিত করলে আমাদের ?

—ভণ্ডুল আমাদের কাছে ক্ষমা চাও। নতুবা .....

—কুহু—কুহু। ভণ্ডুল আংগুল দিয়ে নাক চেপে ধরে ঠাট্টা করে বলে উঠলো।

—ভণ্ডুল এর ফল ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

—কুহু—কুহু।

—গাধার মতো তোমাকে পিটাবো কিন্তু।

—কুহু—কুহু।

—ডাংগা নাক নিয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

—কুহু-কুহু।

সহসা ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছেলেটি চিৎকার করে বলে উঠলো—

—দাঁড়াও, তোমাকে একটা কোকিল দিচ্ছি। এখন এইটা নাও। এর থেকে রাতের খাবারের জন্যেও কিছুটা রেখে দিও। এই বলে ভণ্ডুলের মাথার উপরে সজোরে একটা ঘুষি মেরে দিলো।

পুতুলও ঘুষি মেরে জবাব দিয়েছিলো। লোকে বলে তা ছিলো যেন একটা প্রশ্নের জবাব।

মুহূর্তের মধ্যেই ছোট খাট একটা যুদ্ধ বেঁধে গেলো সেখানে। সবাই মিলে হাতাহাতি শুরু করে দিলো। ভণ্ডুল একা হলে হবে কি—বীরের মতোই রক্ষা করে যাচ্ছিলো নিজেকে। তার শক্ত কাঠের পা দিয়ে সেকি লাথি—লাথির পরে লাথি? তার পা যেখানে গিয়ে লেগেছে এক একটা ক্ষত হয়ে গেছে সেখানেই।

ছেলেরা দেখলো কিছুতেই পেরে উঠছে না তারা। তখন ভণ্ডুলের গায়ে অংক, ইংরেজী, বাংলা, ভূগোল ইত্যাদি বইপত্র ছুঁড়ে মারতে লাগলো। কিন্তু পুতুলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে হেরে যেতে লাগলো বারবার। পুতুল এদিক সেদিক সরে যাচ্ছিলো সংগে সংগে। আর বইগুলো সব পড়লো গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে।



তখন মাছদের আনন্দ দেখে কে! তারা বইগুলোকে মনে করছিলো সব বুঝি খাবার জিনিস। তাই সেখানে দলে দলে জড়ো হ'তে শুরু করে দিলো সবাই। ছো মেরে বইয়ের পাতাগুলো নিয়ে পরক্ষণেই অবহেলা করে ফেলে দিচ্ছিলো আবার। আর বলছিলো—

—এগুলো আমাদের জন্যে নয়। এর চেয়েও ভাল জিনিস খাই আমরা।

ইতিমধ্যে সংগ্রাম খুব জোরদার হয়ে দেখা দিলো। পানি থেকে একটা বড় আকারের কাঁকড়া উঠে এলো তীরে। ছেলেদের একেবারে কাছে এসে গম্ভীর গলায় বললো—



বদমায়েস ছেলেরা। তোমরা থামো বলছি। ছেলেদের এমন মারামারি করা উচিত নয় মোটেই। এতে কখনো কখনো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

বেচারা কাঁকড়ার কন্ঠস্বর বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেলো। দুষ্টু ভণ্ডুল তার দিকে চেয়ে কড়াভাবে বললো—

—বিরক্ত করো না কাঁকড়া—থামো! তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়াটাও এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

লড়াই করতে গিয়ে ছেলেদের বইগুলো এখন সবই শেষ। তাদের চোখ ভণ্ডুলের বইয়ের উপর পড়তেই সেগুলো টেনে টুনে নিয়ে গেলো তারা।

পুতুলের বইয়ের মধ্যে মোটাসোটা চমৎকার একটা বই ছিলো। চামড়ার বাঁধাই সেটা। অংকের বই।

তোমরা ভেবে দেখো কতো ভারী সেই বই। দুষ্টু ছেলেদের মধ্যে একজন সেই বই নিয়ে ভণ্ডুলের মাথা লক্ষ্য করে তার সর্বশক্তি দিয়ে নিক্ষেপ করলো।

কিন্তু কপাল ভালো। পুতুলের মাথায় না লেগে অন্য ছেলের মাথায় গিয়ে লাগলো। সেই ছেলেটি একটা সাদা পরিষ্কার কাপড়ের মতো সাদা হয়ে গেলো।

—মাগো বাঁচাও। আমি মরে গেলাম। এছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারলো না ছেলেটি। তীরে বালুর উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো।

এমনি অবস্থা দেখে ছেলেরা ভয়ে সুড়সুড় করে পালাতে লাগলো। তাদের ধারণা মরে গেছে ছেলেটি।



কিছুক্ষণের মধ্যেই কাউকে দেখা গেলো না সেখানে। কেবল ভণ্ডুল একা। ভয় পেয়েও নড়েনি সে। খুব দুঃখ লেগেছিলো তার। সমুদ্রে রুমাল ভিজিয়ে ইসকুলের সহপাঠী সেই হতভাগ্য বন্ধুটির মাথায় পানি ঢালতে লাগলো। মাঝে মাঝে ভরসা হারিয়ে কাঁদাকাটাও করছিলো। আর ছেলেটির নাম ধরে বলছিলো—

—ভাই বল্টু আমার! চোখ খোলো। আমার দিকে তাকাও। কথা বলছো না কেনো? আমিতো কোনো কষ্ট দিইনি তোমাকে। তোমাকে মারিনি। একবার তাকিয়ে দেখো। তুমি না তাকালে আমিও মরে যাবো তোমার মতো। হায় খোদা, আমি কেমন করে বাড়ী ফিরে যাবো! আমি আমার মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো কি করে! আমার কি হবে! কোথায় গিয়ে পালাবো। কোথায় গেলে নিজেকে লুকাতে পারবো। ইসকুলে গেলে কতোই না ভালো হোত! ছেলেদের কথা শুনেই আমার সর্বনাশ হোল। মাস্টার এবং আমার মা কতোবার বলে দিয়েছেন দুষ্টু ছেলেদের থেকে সাবধান থাকতে। সত্যিই আমি একটা বড্ড বাজে ছেলে। মুরুব্বীদের কথা শুনিনা

মোটেই। পরিণামে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় অনেক। আমার কি যে হবে।

ভণ্ডুল কেঁদে কেটে নিজের মাথায় ঘুষি মারতে লাগলো। আর সেই বেচারা বল্টুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিলো।

হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দ পেলো ভণ্ডুল। মুখ ফিরিয়ে দু'জন পুলিশকে দেখতে পেলো সে। তারা ভণ্ডুলকে জিজ্ঞেস করলো।

—এখানে মাটিতে বসে বসে কি করছো?

— এই আমার ইসকুলের বন্ধুটিকে সাহায্য করছি।

— কেনো, শরীর খারাপ নাকি?

— মনে হয়।

—খারাপ? একজন পুলিশ বললো ছেলেটাকে দেখিয়ে। ওর মাথায় তো আঘাতের দাগ। কে মেরেছে ওকে?

—আমি নই। পুতুল জোর গলায় বললো।

—তুমি নও! তবে কে ওকে অমনভাবে ক্ষত বিক্ষত করেছে?

—আমি নই। ভণ্ডুল আবার বললো।

—যে-ই-মেরে থাকুক—বলো কি দিয়ে মারা হয়েছে?

—এই বই দিয়ে। পুতুল সেই অংকের বইটা হাতে নিয়ে পুলিশকে দেখাতে বললো।

—এই বই কার?

—আমার।

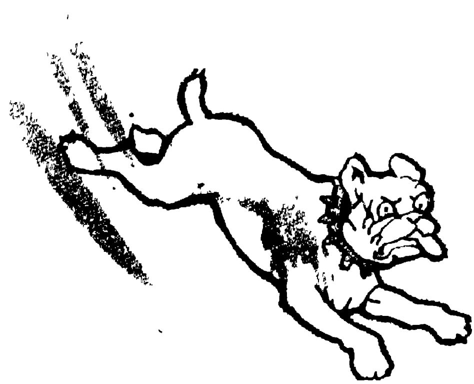
—যথেষ্ট। আর প্রমাণের দরকার হবে না। ওঠো! আমাদের সংগে এসো।

—কিন্তু আমি .. ..

—আমাদের সংগে এসো।

—আমি যে নির্দোষ!

—এসো বলছি আমাদের সংগে।



জেলেরা যাচ্ছিলো সে পথ ধরে। চলে যাবার আগে

পুলিশ দু'জন তাদেরকে ডেকে বললো—

—এই আহত ছেলেটাকে তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম। ঘরে নিয়ে গিয়ে একে যত্ন করো। কাল আবার এসে দেখে যাবো আমরা। পরে ভণ্ডুলের দিকে ফিরে কি যেন ভাবলো। পরক্ষণেই তাকে ওদের দু'জনের মাঝখানে নিয়ে সৈন্যের মতো হুকুম করলো—

—চলো। জলদি করে চলো। নতুবা খারাপ হবে কিন্তু।

কি আর করে পুতুল। অগত্যা যেতেই হোল। কিন্তু বেচারা বুঝতে পাচ্ছিলো না কিছুই। একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে রয়েছে সে। সে যেন একটা পাগল। চোখে অন্ধকার দেখছিলো। পা দুটো কাঁপ-ছিলো। মুখের ভিতরে এঁটে গিয়েছিলো জিভটা। কোনো কথাই বলতে পারছিলো না সেই মুহূর্তে। এতো সব কাণ্ডকারখানা দেখে তার হৃদয়ে কি যেন কাঁটার মতো বিঁধছিলো।

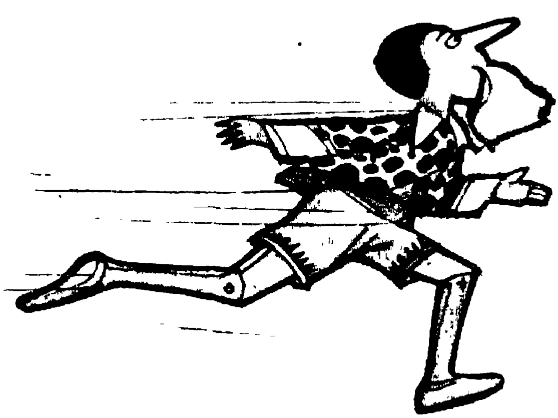
এমনি করে দুই পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে তাকে পরীর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে? এর চেয়ে তার পক্ষে মরণও ভালো।

ওরা গ্রামে ঢুকলো। অকস্মাৎ বাতাসের একটা ঝাপটা এসে ভণ্ডুলের মাথা থেকে টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেলো। আর হাত দশেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলো। পুতুল পুলিশকে বললো—

—আপনাদের অনুমতি পেলে আমার টুপিটা নিয়ে আসতাম।

—যাও, তাড়াতাড়ি করো।

টুপি কুড়াতে গেলো পুতুল। কিন্তু মাথায় না বসিয়ে দাঁতে চেপে রাখলো। আর সমুদ্রের দিকে দৌড়িয়ে পালাতে শুরু করে দিলো।



বন্দুকের গুলীর মতোই দ্রুত চলছিলো সে। পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না বুঝতে পেরে তার পিছনে মস্তবড় একটা কুকুর লেলিয়ে দিলো।

কুকুরটির কিন্তু নাম-ডাক খুব। সে দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছিলো।

ভণ্ডুল ছুটছে। ছুটছে। কুকুরও ছুটিছে পিছু পিছু।

এইসব দৃশ্য দেখে সেখানকার লোকজনেরা ভীড় জমাতে লাগলো। কিন্তু ওরা এতো ধূলো উড়িয়ে ছুটে চলেছিলো যে কিছুক্ষণ পরে ওদেরকে আর দেখাই যাচ্ছিলো না।

।। আঠাশ ।।

ভণ্ডুল মাছের সংগে সিদ্ধ হ'তে গিয়ে বিপদে পড়ে যায়।

ভণ্ডুল আর কুকুরের ছুটাছুটি শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হোল। ভণ্ডুল ভাবলো, তার সব বুঝি শেষ হয়ে আসছে।

কুকুরটির নাম—খটক। ছুটতে ছুটতে প্রায় ধরে ফেলেছিলো ভণ্ডুলকে। এতো কাছাকাছি এসে পড়লো যে তার গরম নিশ্বাস এসে লাগছিলো ভণ্ডুলের গায়ে।

ভাগ্যিস, সেখান থেকে সমুদ্র অতি নিকটেই ছিলো। নইলে কি যে হোত বলা যায় না। তীরে এসেই ভণ্ডুল ব্যাঙের মতো এক লাফে পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

খটক তখনো দৌড়াচ্ছে। সমুদ্রের কাছে এসে তাল সামলাতে না পেরে পানির মধ্যে পড়ে গেলো সে। দুর্ভাগা কুকুরটি সাঁতার জানতো না। পানিতে পড়ে শুধু হাবুডুবু খেতে লাগলো। বেচারা যতোই হাত-পা ছুঁড়ছিলো পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলো ততোই। এক সময় চেষ্টা করে পানির উপরে মাথা তুলে দিলো। লাল লাল বড় বড় চোখ দুটো ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠলো—

—ডুবে যাচ্ছি। ডুবে যাচ্ছি।

—মরো। মরো। ভণ্ডুল দূর থেকে জবাব দিলো নিজেকে বিপদ মুক্ত দেখে।

—আমাকে সাহায্য করো ভণ্ডুল। মরণের হাত থেকে বাঁচাও।

খটককে অমন করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে দেখে পুতুলের প্রাণটা গলে গেলো। মায়া লাগলো খুব। কুকুরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো—

—তোমাকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো আমার পিছনে লাগবে না।

—প্রতিজ্ঞা করছি—প্রতিজ্ঞা করছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো ভাই। নইলে মরে যাচ্ছি আমি।

ভণ্ডুল ইতস্তত করলো একটু। বাবার কথা মনে পড়ে গেলো তার। বাবা অনেকবার তাকে বলেছিলো কথাটা। কোনো ভালো কাজে নাকি বিপদের ভয় থাকে না—করতেও নেই।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত পুতুল সাঁতার কেটে খটকের কাছে গেলো। তার লেজটাকে ধরে একটা শুকনো জায়গা দেখে তীরে টেনে তুললো। বেচারা কুকুরের অবস্থা তখন কাহিল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছিলো না। এতোক্ষণ পানি খেয়ে খেয়ে একটা বলের মতোই ফুলে উঠেছে সে।

পুতুল সাবধানে থাকতে চেয়েছিলো। তাই সে তাড়াতাড়ি করে আবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বেশ কিছুদূর গিয়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত বন্ধুকে চিৎকার করে বললো—

—টা-টা খটক। তোমার মংগল হোক। তোমার বাড়ীর সবাইকে আমার শুভেচ্ছা দিও।

—টা-টা ভণ্ডুল। কুকুর উত্তর দিলো। তুমি আমাকে বাঁচালে। সহস্র ধন্যবাদ তোমাকে। একটা মস্তবড় উপকার করে গেলে তুমি। ঠিক আছে। এ সংসারে যার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাকে ফিরিয়ে দেবো আবার। সুযোগ পেলেই আমার কর্তব্য পালন করবো আমি।

ভণ্ডুল আগের মতোই সাঁতার কাটছে। তীর ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে সে। এতোক্ষণ পরে আশ্বস্ত হয়েছে। আর কোনো বিপদ নেই তার। হঠাৎ তীরের দিকে নজর পড়ে গেলো পুতুলের। পাথরের মধ্যে গুহার মতো কি যেন দেখতে পেলো সে। সেখান থেকে লম্বা গোছের একটা ধূম-রেখা বেরিয়ে আসছিলো। মনে মনে বললো—

—ওর ভিতরে নিশ্চয়ই আগুন জ্বলছে। বেশ ভালোই হোল। আমি ওখানে গিয়ে নিজেকে একটু গরম করে শুকিয়ে নেবো। তারপর যা

হয় দেখা যাবে। মন স্থির করে ভণ্ডুল সেদিকে এগ্রিয়ে গেলো। কিন্তু সেখানেও বিপদ। কাছাকাছি যেতে না যেতেই কি একটা জিনিস এসে পানি ছুঁয়ে উপরের দিকে উঠলো। আর মুহূর্তেই ভণ্ডুলকে আকাশের দিকে উড়িয়ে নিলো।

পালাবার অনেক চেষ্টা করলো ভণ্ডুল। কিন্তু তার আগেই নিজেকে অনেক মাছের সাথে একটা বিরাট জালে বন্দি হতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো সে। মাছগুলো অনবরত দাপাদাপি করছিলো।

ঠিক সেই সময়ে একটা জেলেকে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। লোকটা দেখতে ভীষণ কুশ্রী। তাকে দেখলে সাগরের কোনো রাক্ষস বলে মনে হবে। মাথায় চুলের বদলে সবুজ ঘাসের ঘন ঝোপ। দেহের চামড়া সবুজ। চোখ সবুজ। লম্বা দাঁড়িগুলোও সবুজ। একটা আস্ত গুঁই সাপের মতো দেখতে আর কি!

জেলে পানি থেকে জাল তুলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো—

—অনেক ধন্যবাদ খোদাকে। আজ অনেক ভালো ভালো মাছ খেতে পারবো।

জেলের কথা শুনে ভণ্ডুল একটু আশ্বস্ত হোল। মনে মনে অনেক আশাই পোষণ করে এসেছিলো সে।

—বাঁচলাম তাহলে। তেমন অসুবিধে আমার হবেনা। আমি তো আর মাছ নই!

জালে মাছ ভর্তি তখনো। অন্ধকার সেই গুহাটির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হোল সেগুলো। চারিদিকে শুধু ধুঁয়া। মাঝখানটায় চুলোর উপরে একটা হাঁড়ি। হাঁড়ির মধ্যে ফুটন্ত তেলের টগ্-বগ্ শব্দ। কি ধরনের একটা বিশ্রী গন্ধে ভরে গিয়েছিলো সমস্ত গুহাটা। ভণ্ডুলের দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল। ওদিকে সেই সবুজ জেলে বললো—

—কি কি মাছ ধরে আনলাম দেখি!—এই বলে জালের মধ্যে প্রকাণ্ড হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে মাছ তুলতে লাগলো সে। আর এক এক করে নাকে শুঁকে তার স্বাদ পরীক্ষা করে একটা পানিভরা বালতিতে রেখে আবার বললো—

—এই কইটা বেশ ভালোই।

—চমৎকার এই কাত্‌লা মাছটা!



—এই যে চিতল মাছ, তোমাকে খেতে খুব মজা হবে।

—এই রুই মাছটাও খুব ভালো লাগছে আমার কাছে।

অবশেষে জালের মধ্যে শুধু ভণ্ডুলই রইলো। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড! যেই না জেলে তাকে জাল থেকে বের করলো অমনি তার বড় বড় সবুজ চোখ আরো বড় হয়ে গেলো। সে একরকম চিৎকার করেই বলে উঠলো—

—এটা আবার কোন্ জাতীয় মাছ! এমন ধরনের মাছ খেয়েছি বলেতো মনে হয় না। তারপর সে মাছটাকে ভালোকরে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে লাগলো। আর বললো—

—বুঝেছি। এটা হোল গিয়ে সাগরের কাঁকড়া।

কথাটা ভালো লাগলো না ভণ্ডুলের। সে প্রতিবাদ জানালো।

—কাঁকড়া নয় কাঁকড়া নয়। সাবধান, আজে বাজে কথা বলবেন না। জেনে রাখবেন, আমি একটা পুতুল।

—পুতুল! জেলে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো। সত্যি করেই বলছি, পুতুল মাছ আমার কাছে একেবারেই নতুন। ভালোই হোল—বেশ মজা করেই খাওয়া যাবে।

—আমাকে খাবেন? বুঝছেন না কেনো আমি মাছ নই! শুনতে পাচ্ছেন না আমি আপনার মতোই কথা বলছি?

—সত্যিই তো। জেলে আবার বললো। তুমি একটা মাছ, যে নাকি কথা বলতে পারে। যার বিবেচনা শক্তি আমার মতোই। যাহোক, আমি তোমাকে যাতে সদ্‌ব্যবহার করতে পারি সেই চেষ্টাই করবো।

—কেমন করে সদ্‌ব্যবহার করবেন?

—বন্ধু হিসেবে তুমিই না হয় বলো—কেমন করে তোমাকে ভেঁজে খেতে পারি। পানি, দুধ, না তেলের সংগে?

ভণ্ডুল উত্তর দিলো—

—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ী ফিরে যেতে চাই।

—এটা কি খেলা নাকি! এমন নতুন চমৎকার মাছকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো? রোজ তো পুতুল মাছ ধরতে পারিনা! যাক, আমি একটা ব্যবস্থা করছি। অন্য মাছের সংগে তোমাকেও সিদ্ধ করে খাবো। তুমি আর আর সব মাছদের সাথে মিলে সিদ্ধ হবে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

এসব কথা না শুনে ভণ্ডুল কান্নাকাটি জুড়ে দিলো।

—হায়, যদি ইসকুলে যেতাম কতো ভালোই না হোত! দুষ্টু বন্ধুদের কথা না শুনলে হয়তো আজ আমাকে এমন দুর্দশায় পড়তে হোত না। হায়-হায়-হায়-হায়-----------

ভণ্ডুল ছাড়া পাবার জন্যে শুধু ছট্‌-ফট্‌ করতে লাগলো। জেলে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অন্যসব মাছের সংগে এক পাশে ফেলে রাখলো।

কিছুক্ষণ পরে ছাই শুদ্ধ একটা বালতি বের করে সেই মাছগুলো পরিষ্কার করতে লেগে গেলো সে।

একটার পর একটা মাছ পরিষ্কার হতে লাগলো। আর জেলে সে-গুলো একে একে ফুটন্ত সেই হাঁড়ির মধ্যে ছেড়ে দিতে লাগলো।

এবার ভণ্ডুলের পালা। ভণ্ডুল মৃত্যুকে আসন্ন দেখে (কি ভয়ানক মৃত্যু) ভয় পেয়ে গেলো খুব। কাঁপতে কাঁপতে কোনো কথাই বলতে পারলো না। এমন কি নিশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল। বেচারা পুতুল শুধু চোখ দিয়ে অনুরোধ করে যাচ্ছিলো।

কিন্তু সবুজ জেলে তার দিকে ফিরেও তাকালো না।

পুতুলকে কয়েকবার ছাইয়ের মধ্যে নাড়াচাড়া করায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা সাদা মূর্তির মতো মনে হোল তাকে। পরে মথা ধরে ....

॥ উনত্রিশ ।

ভণ্ডুল পরীর ঘরে ফিরে আসে। পরী তাকে শপথ করে কথা দেয় যে সে আর পুতুল থাকবে না। অন্যান্য ছেলেদের মতো একটা ভালো ছেলে হবে। অবশেষে এই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়।

জেলে ভণ্ডুলকে হাঁড়ির মধ্যে ফেলতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা কুকুর মাছের গন্ধ পেয়ে সেই গুহার ভিতরে ঢুকলো।

—দূর হও। পুতুলকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে ভীষণভাবে চেঁচিয়ে উঠলো জেলে।

আসলে বেচারা কুকুরটির ক্ষিদে লেগেছিলো খুব। সম্ভবত এই কথাটাই লেজ নেড়ে সে বলতে চেয়েছিলো।

—যে পর্যন্ত কিছু মাছ খেতে না দেবে তোমাকে বিরক্ত করবোই।

—দূর হও বলছি! জেলে আবার ধমক দিলো। আর একটা পা বাড়িয়ে তাকে লাথি মারতে উদ্যত হোল।

কুকুরটার কিন্তু সত্যিই ক্ষিদে লেগেছিলো। সে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। দাঁত বের করে রাগে কট্‌মট্‌ করতে লাগলো। সহসা গুহার ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

—খটক আমাকে উদ্ধার করো। তুমি যদি আমাকে না বাঁচাও মরে যাবো আমি। আমাকে গরম তেলে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে।

ভণ্ডুলের কণ্ঠস্বর আর বুঝতে বাকী রইলো না খটকের কাছে। ভণ্ডুলকে জেলের হাতে দাপাদাপি করতে দেখে অবাক হোল সে। এখন উপায়? কুকুর কি যেন ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়লো জেলের উপর। মুখ দিয়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিলো ভণ্ডুলকে। তারপর বিদ্যুৎ বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

পুতুল মাছটাকে হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে দেখে জেলে স্থির থাকতে পারলো না। সে পুতুলের পিছনে পিছনে ছুটে গেলো। কিন্তু বেশীক্ষণ অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হোল না। হঠাৎ কাশি এসে গেলো। আর দৌড়াতে পারলো না।



এদিকে খটক গ্রামের রাস্তায় এসে পৌঁছালো। একটা ভালো জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে ভণ্ডুলকে সযত্নে মাটিতে রেখে দিলো।

পুতুল বললো—

—কি দিয়ে যে ধন্যবাদ জানাই তোমাকে!

কুকুর উত্তর দিলো—

—ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। তুমিও একদিন আমাকে উদ্ধার করেছিলে। সে বিপদের কথা মনে আছে আমার। একে অপরকে বিপদে-আপদে সাহায্য করতে হবে। এটাই তো জগতের নিয়ম।

—কিন্তু কেমন করে গুহায় প্রবেশ করলে তুমি?

—আমি তীরে শুয়েছিলাম মরার মতো হয়ে। হঠাৎ বাতাসে খাবারের সুগন্ধ ভেসে এলো। খুব ক্ষিদে লেগেছিলো আমার। কিছু খাবারের লোভে অনুমান করে ওখানে চলে গেলাম। বেশ ভালোই হোল। তোমাকে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসতে পেরেছি।

ভণ্ডুল ভয়ে তখন কাঁপছিলো। বললো—

—আর বোল না ভাই—আর বোল না। আর এক মুহূর্ত দেরী হলেই কাজ সেরেছিলো। হাঁড়ির মধ্যেই তেলে ভাজা হয়ে যেতাম। তারপর তো বুঝতেই পারছো—একদম জেলের পেটে। বাপরে বাপ্! ভাবতে গেলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

হেসে উঠলো খটক। নিজের পা-টা ভণ্ডুলের দিকে এগিয়ে দিলো। ভণ্ডুলও এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর সাথে করমর্দন করলো। তারপর দুজনে দুজনের কাছে বিদায় চেয়ে যে যার দিকে চলে গেলো।

কুকুর ধরলো বাড়ীর পথ। আর ভণ্ডুল সামনের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলো। এক বুড়ো রোদ পোহাচ্ছিলো সেখানে। পুতুল গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো—

—আচ্ছা বাবা, বল্টুকে চেনেন? তার কোনো খবর জানেন নাকি?

—হ্যাঁ। কয়েকজন ছেলে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এবং এখন...

—এখন কি—মারা গেছে নাকি? ভণ্ডুল উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—না না। সে জীবিতই আছে। এখন নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে।

—সত্যিই? পুতুল আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলো। তাহলে খুব গুরুতর আহত হয়নি—কি বলেন?



বুড়ো বললো—

—মারাত্মকভাবেই লেগেছিলো। তার মাথায় একটা ভারী বই ছুঁড়ে মেরেছিলো।

—কে—কে মেরেছিলো?

—তারই ইসকুলের এক বন্ধু ভণ্ডুল?

ভণ্ডুল নিজের পরিচয় ঢাকতে গিয়ে বললো—

—কে সেই ভণ্ডুল?

—লোকে বলে একটা দুষ্টু ছেলে। সত্যিই একটা বদমায়েস।

—মিথ্যা। সব মিথ্যা।

—তুমি ভণ্ডুলকে চেনো?

পুতুল উত্তর দিলো—

—হ্যাঁ, নাম শুনেছি।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলো—

—তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

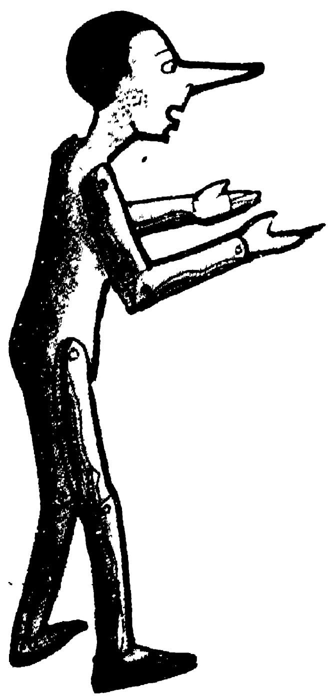
—যতোদূর জানি খুব ভালো ছেলে সে। পড়াশুনা করবারও খুব ইচ্ছে তার। সবার বাধ্যগত। তার বাবা ও পরিবারের সবাইকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে।

এমনি করে একের পর এক মিথ্যা কথা বলতে বলতে সহসা পুতুলের হাত গিয়ে পড়লো নিজের নাকের উপর। আর অমনি টের পেলো তার নাক প্রায় বিঘত খানেক লম্বা হয়ে গেছে। তখুনি ভয়ে জড়সড় হয়ে বললো—

—আমার কথা বিশ্বাস করবেন না বাবা। আমি ভণ্ডুলকে খুব ভালো করেই চিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। সত্যি সত্যিই ভয়ানক দুষ্টু সে। কথার অবাধ্য। পড়াশুনা করতে চায় না মোটেই। খারাপ ছেলেদের সংগে মিশে কেবল বদমায়েসী করে বেড়ায়।

কথা কয়টা শেষ করতেই ভণ্ডুলের নাক আবার আগের মতোই হয়ে গেলো।

বুড়ো পুতুলকে জিজ্ঞেস করলো—



—তোমাকে অমন ফ্যাকাশে লাগছে কেনো?

—বলছি। আমি একটা চুন মাখানো দেয়ালের গা ঘেঁষে হেঁটেছিলাম। পুতুল উত্তর দিলো আসল কথাটা ঢেকে রেখে।

—কোথায় তোমার কোট, কোথায় প্যাণ্ট, আর টুপিইবা কোথায়?

—ডাকাতের হাতে পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে কিছু কাপড়-চোপড় দিতে পারেন?

—আমার তো তেমন বেশী কাপড় নেই বাবা! তবে একটা বস্তা আছে। যদি ইচ্ছে করো নিতে পারো তুমি।

ভণ্ডুল বস্তাটাই চেয়ে নিলো। কাঁচি

দিয়ে প্রথমে উপরের কিছুটা অংশ এবং পরে দু পাশে দু'টি গর্তের মতো করে কেটে গায়ে পরে নিলো। এই পোশাকেই অবশেষে সে গ্রামের পথে পা বাড়ালো।

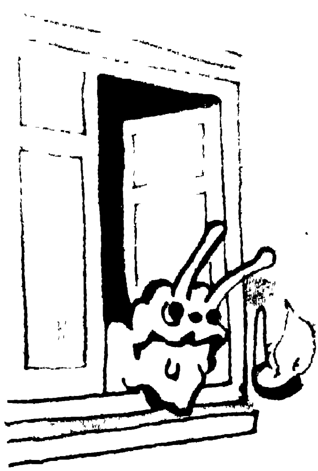
পথে খুবই অস্বস্তি লাগছিলো পুতুলের। মনে মনে ভাবলো—

—এই অসময়ে কেমন করে পরীর কাছে যাবো। এমন অবস্থায় দেখলে সে বলবেই বা কি! সে কি ক্ষমা করবে আমাকে? না, কিছুতেই না। ক্ষমা না করাটাই স্বাভাবিক। কেননা, ভালো পথে চলবো বলে সব সময়ই প্রতিজ্ঞা করে এসেছি। কিন্তু তা রাখতে পারিনি একটিবারও।

অনেক রাত তখন। ভণ্ডুল গ্রামে এসে পৌঁছালো। আকাশের অবস্থাও সুবিধের নয়। বিষ্টি পড়ছিলো। সে সোজাসুজি পরীর ঘরের দিকে চলে গেলো।

কিন্তু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পরীকে ডাকা তো দূরে থাকুক প্রায় কুড়ি হাত ছিট্‌কে পড়লো দূরে। দ্বিতীয়বার গিয়ে ধাক্কা মারতে সাহস হোল না আর। তৃতীয়বারও না। চতুর্থবার না পেরে ধাক্কা মেরেই বসলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত একটা জানালা হঠাৎ খুলে গেলো। একটা শামুক মাথা বের করে দিলো সে জানালা দিয়ে। তার মাথায় ছিলো একটা জ্বলন্ত আলো। সে জিজ্ঞেস করলো—



- কে ডাকছো এই অসময়ে?

পুতুল পাল্টা জিজ্ঞেস করলো

- পরী বাড়ী আছে?

—সে ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগানো যাবে না। কিন্তু তুমি কে?

—আমি।

—আমি কে?

—ভণ্ডুল।

—ভণ্ডুল কে?

—পুতুল। পরীর ঘরে যে থাকতো সেই পুতুল।

—ও বুঝেছি। শামুক বললো। দাঁড়াও, আমি নেমে এসে দরজা খুলে দিচ্ছি।

—দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন। আমি শীতে কষ্ট পাচ্ছি খুব।

—দেখো আমি শামুক। শামুকেরা কখনো ব্যস্ত হয়ে কিছু করতে পারে না।

এমনি করে প্রায় ঘন্টা খানেক কাটালো। দু'ঘন্টা পার হয়ে গেলো। কিন্তু দরজা আর খুললো না।

একেতো দারুন শীত। তারপর আবার বিষ্টির পানিতে ভিজে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো ভণ্ডুল। অসহ্য হয়ে খুব জোরে কড়া নাড়লো সে। এইবার পাশের জানালাটা খুলে গেলো। আর শামুক আগের মতোই মাথা বের করে দিলো। ভণ্ডুল সেখান থেকেই জোরে জোরে বললো—

—শামুক ভায়া আমার—দু'ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি। এই দুঃসহ রাতে একটু তাড়াতাড়ি করুন।

—কি করবো ভাই। শান্ত গলায় জবাব দিলো শামুক। দেখো, আমি একজন শামুক। শামুক কখনো ব্যস্ত হয়ে কিছু করতে পারে না।

আবার জানালা বন্ধ হয়ে গেলো। পরপরই বারোটার ঘন্টা হোল। তারপর এক। অতঃপর দুই। তবুও দরজা বন্ধ রইলো।

কতোক্ষণ আর এভাবে থাকা যায়? না পেরে তখন ভণ্ডুল দরজা ধাক্কাতে শুরু করে দিলো। প্রচণ্ড আঘাতে গোটা ঘরখানাই কেঁপে উঠলো সেই সাথে। কিন্তু ফল হোল না কিছুই।

অবশেষে ভণ্ডুল একটু পিছন থেকে এসে সজোরে এক লাথি কষে দিলো দরজাটায়। কিন্তু এবারে ফল হোল উল্টো। দরজা ভেংগে পা-টা ঢুকে গেলো ভিতরে।

অনেক চেষ্টা তাগিদ চললো। পা কিছুতেই আর বের করা যায় না। পেরেকের মাতা কাঠের সংগে আটকে গেছে। বেচারা ভণ্ডুলের তখন দুর্দশা দেখে কে! ওই অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে রইলো সারাটা রাত।

দরজা যখন খোলা হোল তখন সকাল। পূব দিক পুরোপুরি ফর্সা হয়ে গেছে। কি তাজ্জব ব্যাপার! জানালা থেকে দরজা পর্যন্ত আসতে শামুকের পাক্কা ন'টা ঘণ্টা কেটে গেলো। নিশ্চয়ই তার খুব কষ্ট হয়েছে। হেসে পুতুলকে জিজ্ঞেস করলো—

—অমনভাবে দরজায় পা ঢুকিয়ে দিয়ে কি করছো?

—বিপদে পড়ে আছি শামুক ভায়া। দয়া করে যদি পা-টা বের করে দিতেন!

—আমাকে দিয়ে কি করে সম্ভব? ওটাতো সুতার মিস্ত্রির কাজ।



আমিতো ওকাজ কখনো করিনি!

—যদি আমার পরী মাকে বলতেন।

—পরী ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগানো যাবে না।

—তবে আমি কি করবো এখন? কতোক্ষণ এভাবে দরজায় আটকে থাকবো?

—তুমি বরং এক কাজ করো। রাস্তার ওই পিঁপড়েগুলো গুনতে থাকো।

—কমপক্ষে আমাকে কিছু খেতে সহ্য করতে পারছি না মোটেই।

—বেশ, এক্ষুনি দিচ্ছি।

অবশেষে প্রায় সাড়ে-তিন ঘণ্টা পরে ভণ্ডুল শামুকের মাথায় একটা রূপোর থালা দেখতে পেলো। তার ভিতরে ছিলো ভাত এবং মুরগীর তরকারি। আর ফলের মধ্যে ছিলো চারটে নাসপাতি।

এসেই শামুক বললো—

—পরী তোমাকে এই নাস্তাগুলো পাঠিয়েছে।

—এসব ভালো ভালো জিনিস দেখে পুতুল তো আনন্দে আটখানা। কিন্তু তার ভুল ভাঙলো সেগুলো খেতে গিয়ে। দেখা গেলো, যেগুলো ছিলো ভাত—আসলে তা বালু। মুরগীর তরকারি তো নয়—কতগুলো কাগজ। আর নাসপাতি চারটে হোল, সব পাথর।

কাঁদতে ইচ্ছে করলো পুতুলের। এমন অবস্থায় পড়লে কার না কান্না আসে! সবগুলো ধরে বাইরে ফেলে দেবে নাকি? দুঃখের পরে দুঃখ? হঠাৎ মূর্ছা গেলো ও।

জ্ঞান ফিরলে ভণ্ডুল নিজেকে একটা বিছানায় শোয়া দেখতে পেলো।

পাশেই ছিলো পরী। সে বললো—

—এবারও ক্ষমা করলাম। কিন্তু সাবধান! আর কখনো এমন কিছু দেখলে মজা বের করে দেবো।

ভণ্ডুল সংগে সংগে দিব্যি করে বললো—

—এখন থেকে আমি রীতিমতো পড়াশুনা করবো। আর কোনোদিন দুষ্টুমি করবো না।

সত্যি সত্যিই শপথ রক্ষা করেছিলো ভণ্ডুল। সারাটা বছর ধরেই রীতিমতো পড়াশুনা করলো সে। প্রায় সব রকম দুষ্টুমি থেকেই দূরে রইলো। কাজেই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষকদের প্রশংসা পেলো খুব। তারা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—

—অবশেষে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে কাল।

—মানে ?

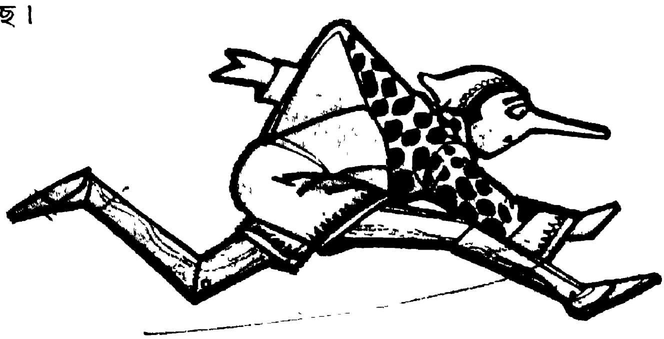
—কাল থেকে তুমি আর পুতুল থাকবে না। একটা ভালো ছেলে হয়ে যাবে।

যারা ভণ্ডুলের সুখে সুখী নয়—ভণ্ডুলের তখন যে কি আনন্দ তা কল্পনাও করতে পারবে না তারা।

পরদিন ইসকুলের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হলো। ভণ্ডুলের সাফল্যে পরী নিজে যেচেই এই উৎসবের ব্যবস্থা করলো। সে কি ধুমধামের ঘটা! অনেক থালা-বাসন, চা'র কাপ, গ্লাস ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হোল। যেন সেটা ছিলো এক চরম আনন্দের দিন। কিন্তু ..

.. ..

দুর্ভাগ্যের বিষয় পুতুলের জীবনে এমন অনেক 'কিন্তু-ই' আছে যা তার অনেক কিছুই নষ্ট করে দিয়েছে। তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে।



॥ ত্রিশ ॥

কপাল দোষে ভণ্ডুল তার বন্ধু টেমির সংগে খেলাধূলার দেশে গেলো। একটা ভালো ছেলে হবার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'তে হলো তাকে।

স্বাভাবিকভাবে সব জায়গায় দাওয়াত দেবার জন্যে ভণ্ডুল পরীর কাছে অনুমতি চাইলো। পরী তাকে বললো—

—যাও, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের কাল খাবারের জন্যে দাওয়াত করে এসো। কিন্তু মনে রেখো—রাত হবার আগেই ঘরে ফিরে আসা চাই, বুঝেছো?

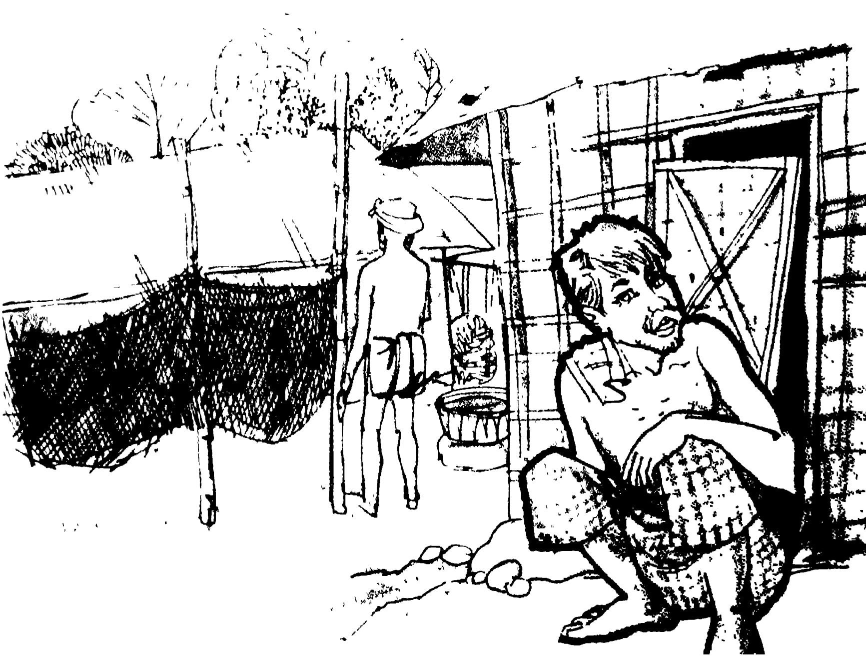
—বুঝেছি। কথা দিচ্ছি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরে আসবো।

—সাবধান ভণ্ডুল। ছেলেরা কথায় কথায় অমন দিব্যি করে। কিন্তু শেষকালে রক্ষা করতে পারে না একটিও।

—আমিতো আর অন্যসব ছেলেদের মতো নই। আমি যা বলি, কাজের বেলায়ও তা-ই করে থাকি।

—দেখা যাক্। যদি একান্তই অবাধ্য হও—তোমার ভোগ তোমাকেই ভুগতে হবে। আমার তাতে কি!

—কেনো—ওকথা বলছেন কেনো?



—যেসব ছেলেরা গুরুজনের অবাধ্য, তাঁদের কথা মতো চলে না, পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হয় তারা।

ভণ্ডুল বললো—

—সে প্রমাণ আমি আগেই পেয়েছি। এখন আর ওসবের মধ্যে নেই।

—দেখা যাবে তোমার কথার সত্যি কতোখানি।

আর কিছু না বলে পুতুল তার মায়ের মতো সেই সুন্দরী পরীকে সালাম জানিয়ে গান গাইতে গাইতে ছুটে বের হয়ে গেলো।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করে এলো পুতুল। কেউ কেউ বলার সংগে সংগেই দাওয়াত কবুল করলো। কেউ কেউ যারা প্রথমে আপত্তি জানালো তারা পরে মিষ্টি, কোকো, দুধ, মাখন প্রভৃতির লোভে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দিলো—

—আমরা যাবো। শুধু তোমাকে আনন্দ দেবার জন্যেই যাবো।

তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে ইসকুলের এইসব বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও ভণ্ডুলের আরো একটি বিশেষ বন্ধু ছিলো। তার নাম পটলা। কিন্তু সবাই ডাকতো টেমি বলে। কারণ, সে ছিলো একটু পাতলা ও শুকনো গোছের। দেখতে ঠিক রাতের জ্বলন্ত একটা টেমির শিখার মতো। ইসকুলের মধ্যে টেমি ছিলো সবচেয়ে দুষ্টু আর আলসে ছেলে। ভণ্ডুল খুবই ভালোবাসতো ওকে। কাজেই, দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রথমেই ওর কাছে গেলো সে। কিন্তু পাওয়া গেল না ওকে। দ্বিতীয়বার গিয়েও পেলোনা। তৃতীয়বারও না। কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? এদিক সেদিক খুঁজে খুঁজে অবশেষে এক চাষার গোয়াল ঘরে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেলো।

—এখানে কি করছো? ভণ্ডুল, একেবারে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—যাবো এক জায়গায়। মাঝরাতের অপেক্ষায় বসে আছি।

—কোথায় যাবে?

—দূরে—দূরে—বহুদূরে।

—আমি তো তোমাকে খুঁজেই হয়রান। তোমার বাড়ী গিয়ে তিন-তিনবার ফিরে এলাম।

—কেনো—কি ব্যাপার?

—এতো বড় একটা খবর রাখো না! আমার ভাগ্যে কি হতে যাচ্ছে তা জানো না?

— কি?

—আমি কাল থেকে আর পুতুল থাকছি না। তোমার ও অন্যান্য ছেলেদের মতো মানুষ হয়ে যাবো।

— বেশতো ভালোই।

— তাহলে কালকে আমার ঘরে তোমার দাওয়াত রইলো।

—কিন্তু আজ রাতেই তো চলে যাচ্ছি আমি।

— কখন?

—একটু পরেই।

— কোথায় যাবে?

— সে এক নতুন দেশে। সেখানে গিয়েই থাকবো ...সেই দেশ জগতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো দেশ। কি ভাগ্য আমার!

—নাম কি সেই দেশের?

— 'খেলাধূলার দেশ"। যাবে নাকি আমার সংগে?

—আমি? না, তা একেবারেই সম্ভব নয়।

— ভুল করছো ভণ্ডুল। আমাকে বিশ্বাস করো। গেলে তোমারই ভালো হবে। আমরা ছেলেমানুষ। আমাদের জন্য অমন দেশ আর কোথায়? ওখানে ইসকুল নেই—মাস্টার নেই—বইপত্র কিছুই নেই। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ বটে! ওখানে কোনোদিন পড়াশুনা করবার দরকার হবে না। সবার চেয়ে মজার হলো ওখানে সপ্তাহে সাতদিনই রবিবার। এখন চিন্তা করে দেখো— ছুটি পয়লা জানুয়ারী থেকে শুরু আর একত্রিশে ডিসেম্বরে গিয়ে শেষ। একেই বলে দেশ! সত্যিই আমার খুবই পছন্দ। সমস্ত উন্নত দেশ এ ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক।

—তবে সেই খেলাধূলার দেশে দিন কাটে কি করে?

— কেনো, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলা করে করে। সন্ধ্যের সাথে সাথেই ঘুম। সকালে আবার খেলা শুরু। কি মনে হয় তোমার?

— হুম। বললো ভণ্ডুল। তারপর মাথা নেড়ে আবার বললো— আমারও অমনভাবে জীবনটা কাটাতে ইচ্ছে হয়।

—তাহলে যাবে—যাবে আমার সংগে ? হ্যাঁ' অথবা 'না' যা হয় বলো একটা।

—না-না-না। একেবারেই না। আমি একটা ভালো ছেলে হবো। পরীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি। এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে আমাকে। যাকগে, সন্ধ্যে হয়ে এলো। এক্ষুণি পালাতে হবে আবার। ধন্যবাদ। আসি—তোমার যাত্রা শুভ হোক।

—সাত তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছো কোথায় ?

—বাড়ীতে। পরী মা সন্ধ্যের আগেই ফিরে যেতে বলেছেন অবশ্য করে।

—দাঁড়াও, দু'মিনিট অপেক্ষা করো।

—না, দেরী হয়ে যাচ্ছে খুব।

—মাত্র দুটো মিনিট।

—পরী মা বকাবকি করবেন তাহলে।

—বকতে দাও। বকে বকে থেমে যাবে শেষে। সেই দুষ্টু টেমি বললো।

—এখন কি করবে তুমি ? একাই যাচ্ছো—না সংগে রয়েছে কেউ ?

—একা ? কমপক্ষে শ'খানেক ছেলে যাবে।



—কিসে যাবে তোমরা—হেঁটে ?

—না। রাত বারোটায় এখান থেকে গাড়ী যাচ্ছে একটা। সেই গাড়ীতেই যাবো আমরা।

—এখুনি যদি রাত বারোটা হোত কি মজাই না হোত!

—কেনো ?

—সবাইকে এক সাথে যেতে দেখতে পারতাম।

—আর একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পারবে।

—না-না থাক। আমি বাড়ী চলে যাই।

—মাত্র দু'মিনিট অপেক্ষা করো।

—দেরী হয়ে গেছে। পরী মা চিন্তায় থাকবেন।

—আহা বেচারী পরী! তিনি কি ভাববেন তোমাকে বাদুড়ে খেয়ে ফেলেছে ?

ভণ্ডুল বললো—

—আচ্ছা তুমি ঠিক জানো সেখানে ইসকুল নেই ?

—ইসকুলের ছায়া পর্যন্ত নেই।

—মাস্টারও নেই ?

—একজনও না।

—ওখানে পড়াশুনার প্রয়োজন নেই ?

—কখনো না। কখনো না। কখনো না।

—কি সুন্দর দেশ! ভণ্ডুল বললো। তার চোখে লোভ এসে গেছে তখন। কি সুন্দর দেশ! আমি না গিয়ে থাকলেও দূর থেকেই কল্পনা করে বলে দিতে পারি।

—তুমি গেলে তো পারতে।

—দেখো, আমাকে প্রলোভন দেখিও না। আমি পরী-মাকে প্রতিজ্ঞা করে কথা দিয়েছি—আমি একটা ভালো ছেলে হবো। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চাই।

—তাহলে বিদায় দাও—আসি। পাঠশালা, হাই ইসকুল এবং কলেজের সবাইকে আমার সালাম জানিয়ে দিও, কেমন ?

—আচ্ছা। তোমার যাত্রা শুভ হোক টেমি। তুমি সুখী হও। আর মাঝে মাঝে তোমার বন্ধু-বান্ধবকে স্মরণ রেখো।

কথা কয়টা বলেই ভণ্ডুল চলে যেতে উদ্যত হোল। আবার পরক্ষণেই ফিরে তাকিয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো—

—তুমি কি নিশ্চিত, সেই দেশে সপ্তাহের সাতদিনই রবিবার?

—একেবারেই নিশ্চিত।

—তোমার কি সঠিক জানা রয়েছে, সেখানে ১লা জানুয়ারী থেকে শুরু করে একত্রিশে ডিসেম্বরে গিয়ে ছুটি শেষ হয়?

—সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকো।

—কি সুন্দর দেশ! ভণ্ডুল আবার বললো। আর অধিক আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো—

—সত্যিই! টা-টা। শুভ যাত্রা।

—টা-টা।

—কখন যাবে?

—ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই।

—সর্বনাশ! যদি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হোত তবে না হয় অপেক্ষা করে যেতাম।

—পরী তাহলে বকবে না তোমাকে?

দেরি যখন হয়ে গেলো তখন এক ঘণ্টা আগে আর পরে একই কথা।

—বেচারা ভণ্ডুল! পরী যদি তোমাকে গালাগালি করে?

—করুক না। গালাগালি করে কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আবার।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল অনেক। ঘোর অন্ধকার। এমনি সময়ে দূরে কয়েকটা ছোট ছোট আলো দেখা গেলো। কোথা থেকে বাঁশী আর ঝুমুরের শব্দ ভেসে এলো।

—এই তো—এই তো। টেমি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো।

—এই তো কি? চুপি চুপি ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করলো।

—যে গাড়ীটায় আমাদের নিয়ে যাবার কথা সেই গাড়ীই এসে পড়েছে। তাহলে যাবে নাকি?

—কিন্তু কথাগুলো সব সত্যিই তো? পুতুল জিজ্ঞেস করলো। সেই দেশের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করবার কি কোন প্রয়োজনই নেই?

—কখনো না। কখনো না। কখনো না।

—কি সুন্দর দেশ! কি সন্দর দেশ! কি সুন্দর দেশ!

।। একত্রিশ ।।

পাঁচ মাস আনন্দে কাটাবার পর হঠাৎ একদিন ভণ্ডুলের কান গাধার কানে পরিণত হয়। লেজ গজায়। এমনি করে সে পুরোপুরি গাধা হয়ে যায়।

অবশেষে গাড়ী এলো। কোনোরকম শব্দ না করেই এলো। কারণ, তার চাকাগুলো ছিলো ন্যাকড়া আর পাট দিয়ে জড়ানো। এক এক লাইনে দুটো করে মোট চব্বিশটা গাধা মিলে টানছিলো গাড়ীটা।

গাধাগুলো ছিলো কিন্তু সবই এক মাপের। কেবল গায়ের রঙগুলো ছিলো ভিন্ন। কেউ ছাই রঙের, কেউ সাদা, আবার কেউবা ছিলো হলদে আর নীলে ডোরা কাটা।

এদের মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ছিলো, কারুর পায়ের আকৃতিই গাধার পায়ের মতো নয়। মানুষের মতো জুতো ছিলো তাদের পায়ে। গাড়ীর চালক? সে ছিলো একটা বেটে মানুষ। লম্বার চেয়ে বরং মোটাই বেশী। একটা মাখনের বলের মতো আর কি? মাথাটা ছিলো যেন একটা নাসপাতির মতোই লালচে। মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। তার গলাটা বিড়ালের মতো সরু হলেও দেখতে কিন্তু বেশ। তাকে দেখা মাত্রই ছেলেরা প্রেমে পড়ে যেতো। তার গাধাগুলোর পিঠে চড়তে চাইতো। তাকে খাতির যত্ন করতো। যেন সে তাদেরকে খেলাধূলার দেশে নিয়ে যায়।

যাহোক, গাড়ীতে আট থেকে বারো বছরের ছেলেরা সবাই বসে। ভিতরে ভীষণ ভীড়। বসবার জায়গা নেই গোটেই। কোনো রকমে ঠাসাঠাসি করে আছে সবাই। ভীড়ের চোটে নিশ্বাস ছাড়াই মুশকিল হয়ে পড়েছে। তবুও যেন কারো কোনো অসুবিধে নেই। কষ্ট নেই। কোনোরকম অভিযোগও নেই।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা রওনা হবে সেই আজব দেশে। আহা বই নেই, ইসকুল নেই, মাস্টারও নেই! কতো মজা—কতো সুন্দর সেই দেশ! আনন্দের চোটে ক্ষিদে থাকবেনা, পিপাসা থাকবে না, ঘুম থাকবে না, এমনকি নড়তে চড়তেও হবে না সেখানে।

গাড়ী থামলো। চালক অতি আগ্রহে নেমে এসে টেমিকে বললো—

—তুমিও কি যেতে চাও নাকি সেই সৌভাগ্যের দেশে ? বলো, যেতে চাও ?



—নিশ্চয়ই ।

– কিন্তু কেমন করে ! আমার গাড়ীতে জায়গা যে মোটেই নেই । তুমি নিজেই চেয়ে দেখোনা—গাড়ী একেবারেই ভর্তি ।

টেমি বললো—

—থাকুক । দরকার হলে আমি গাড়ীর উপরে বসে যাবো । বলেই একলাফে গাড়ীর উপরে গিয়ে বসলো সে ।

—আর তুমি ? সেই চালক স্নেহের টোনে জিজ্ঞেস করলো ভণ্ডুলকে । তুমি কি করবে ? আমাদের সংগে আসবে, না থাকবে ?

—থাকবো । আমি বাড়ী ফিরে যাবো । পড়াশুনা করবো । ইসকুলে ভালো ছেলেদের সুনাম অর্জন করবো ।

—তোমার উপকার হোক ।

টেমি বললো—

—ভণ্ডুল, আমার কথা শোনো । আমাদের সংগে চলো । অনেক মজা হবে ।

এবারে গাড়ীর ভিতর থেকে চারিটি ছেলে কণ্ঠ মিলিয়ে বললো—

—আমাদের সংগে চলো । অনেক মজা হবে ।

পরক্ষণেই আবার গাড়ীর ভিতরকার সব ছেলেরাই একসাথে বলে উঠলো—

—আমাদের সংগে চলো । অনেক মজা হবে ।

এবার আর নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারলো না পুতুল । মনটা কেমন যেন গলে গেলো ওদের কথায় । বললো,

—তোমাদের সাথে গেলে পরী মা কি বলবেন আমাকে ?

—অতো কথার প্রয়োজন নেই। ভেবে দেখো, আমরা এমন দেশে যাচ্ছি সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যে-কোনো আনন্দ-উৎসবে যোগ দেবার অধিকার আমাদের থাকবে।



ভণ্ডুল কোনো জবাব দিলো না। শুধুমাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। পরে আরেকটা। তারপর আরো একটা শ্বাস ছেড়ে বললো—

—আমাকে একটু বসবার জায়গা দেবে? আমি যেতাম তোমাদের সংগে।

চালক উত্তর দিলো—

—গাড়ী ভর্তি। তবুও আমি যে তোমাকে ভালোবাসি অন্তত তা দেখাবার জন্যে আমার নিজের জায়গাটাই তোমাকে দেবো।

—আর আপনি?

—আমি হেঁটে হেঁটেই যাবো।

—না, তা হয় না। আমি কখনো এমন করতে পারবো না। তার চেয়ে বরং আমি যে-কোনো একটা গাধার পিঠে চড়ে যাই। ভণ্ডুল তারস্বরে বলে উঠলো।

যেমন বলা তেমন কাজ। ভণ্ডুল একটা গাধার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে চড়তে চেষ্টা করলো। কিন্তু যেই না গেছে ভণ্ডুল, অমনি গাধাটা মাথা দিয়ে তার তলপেটে ভীষণভাবে গুঁতো মেরে দিলো। ভণ্ডুল চিৎ হয়ে গিয়ে পড়লো মাটিতে।

তোমরা সহজেই কল্পনা করতে পারো তখন সেই দুষ্টু ছেলেদের হাসাহাসির পাল্লার কথা। হেসে হেসে তারা একে অপরের গায়ে

গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

চালক কিন্তু হাসলো না। সে ধীরে ধীরে সেই বিদ্রোহী গাধার কাছে গিয়ে তাকে চুমু দেবার ভান করে তার ডান কানটা কামড়ে কেটে নিলো। ইতিমধ্যে ভণ্ডুলও রেগে-মেগে এক লাফে গিয়ে গাধাটার পিঠে চড়ে বসলো। এইনা দেখে সব ছেলেরা তখন হাসাহাসি বন্ধ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—

—ভণ্ডুলের জয়। ভণ্ডুলের জয়।—আর সাথে সাথে তালি বাজাতে শুরু করে দিলো। দিলো তো দিলোই। বাজাতেই থাকলো।

সহসা সেই গাধাটা পিছনের পা দিয়ে সজোরে লাথি মারলো ভণ্ডুলকে। লাথি খেয়ে ভণ্ডুল রাস্তার পাশে ভাংগা ইটের গাদার উপরে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

আবার হাসাহাসি শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু চালক আগের মতো হাসলো না। গাধাকে আদর করবার ভান করে চুমু খেয়ে আরেকটা কান কেটে দিলো। তারপর পুতুলকে বললো—

—ওঠো পিঠে। আর ভয় কোর না। এই গাধার মগজটা একটু খারাপ কিনা। তাই কান দুটো কেটে সব ঠাণ্ডা করে দিলাম। সেই সাথে সাথে কিছু বুদ্ধিও ঢেলে দিলাম।



ভণ্ডুল আবার পিঠে উঠে বসলো। এবারে গাড়ী চলতে শুরু করে দিলো। গাড়ী চলছে। গাধাগুলো ছুটে চলেছে রাজপথের উপর দিয়ে। সহসা পুতুলের কানে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এলো।

কেউ বলছে—

—বেচারা ছেলে! তোমার নিজের ইচ্ছে মতোই সব কিছু করে চলেছো। এখন বুঝবে ঠেলা।

ভণ্ডুল ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক তাকালো। কোথা থেকে সেই শব্দ ভেসে আসছে? কিছুই আঁচ করতে পারছে না সে। গাধারা ছুটে চলছিলো তখনো। সংগে সংগে গাড়ীটাও। ছেলেরা গাড়ীর ভিতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। টেমি রেলগাড়ীর মতো শব্দ করেই যাচ্ছে। আর চালক গাড়ীর উপরে বসে গুন্-গুন্ করে গান গাইছে—

— রাতে সবাই ঘুমায়। কিন্তু আমি কোনদিন রাতে ঘুমাই না।'

এমনি করে ওরা আধা মাইল যেতে না যেতেই ভণ্ডুল আবার একই সুরের পুনরাবৃত্তি শুনতে পেলো। কেউ তাকে বলছে—

—মনে রেখো বোকা কোথাকার! ছেলেরা যারা পড়াশুনা করে না, বই, ইসকুল, মাস্টার এদেরকে এড়িয়ে চলে, শুধু খেলা আর ফুর্তি করেই দিন কাটায়, তারা সব সময়ই বিপদে পড়ে। আমি এসব জানি। এবং অনেক প্রমাণও পেয়েছি তার। তোমাকে বলে রাখছি—এমন একদিন আসবে যে, তোমাকেও আমার মতো কাঁদতে হবে। কিছুই করার থাকবে না। বড্ড দেরী হয়ে যাবে তখন।

এসব কথা শুনে পুতুল ভয় পেয়ে গেলো খুব। গাধার পিঠ থেকে নেমে তার মুখ চেপে ধরতে গেলো। মুখের কাছে গিয়ে ভণ্ডুল তো অবাক! গাধা তার কাঁদছে। ঠিক একটা ছোট ছেলের মতোই ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। ভণ্ডুল চিৎকার করে উঠলো—

—এই যে চালক সাহেব। খবর-টবর রাখেন? গাধাটা কাঁদছে যে!

—কাঁদুক—কাঁদতে দাও। বিয়ে করলেই হাসবে তখন।

—আপনি ওকে কথা বলতে শিখিয়েছেন নাকি?

—না। ও নিজে নিজেই কিছু কিছু শিখেছে। বছর তিনেক ধরে কতোগুলো পোষা কুকুরের দলে ছিলো কিনা?

—বেচারা পশু।

—দূর দূর। চালক বললো। গাধার কান্না দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করবার কোনো প্রয়োজন নেই। পিঠে ওঠো। চলো যাই। শীতের রাত। পথও খুব লম্বা চওড়া।

ভণ্ডুল কিছু না বলে তার কথা মতোই কাজ করলো। গাড়ী আবার আগের মতোই এগিয়ে চললো।

পরদিন সকালে বেশ ঘটা করেই ওরা খেলাধূলার দেশে গিয়ে পেঁছিলো। এদেশে অন্যসব দেশের মতো নয়। এখানে সবাই ছেলের দল। যাদের বয়স বেশী তারাই হলো গিয়ে চৌদ্দ বছরের। আর সবচেয়ে ছোটদের বয়স মাত্র আট।



সেখানকার রাস্তাগুলো সব আনন্দ কলরবে মুখরিত হয়ে উঠলো। সব জায়গায়ই ছেলে-দের দল। কেউ কেউ ফুটবল, হা-ডু-ডু, লুকোচুরি, ব্রতচারী এবং পাথর দিয়ে নানা ধরনের খেলা খেল-ছিলো। কেউ ঢিল ছুঁড়ছিলো, কেউ সাই-কেল চড়ছিলো. কেউ কেউ কাঠের ঘোড়ায় চেপে চুপচাপ বসে-ছিলো। আবার কেউ কেউ গল্প-গুজব কর-ছিলো, গান গাচ্ছিলো, ফুর্তিতে হাতাহাতি করছিলো, কেউ কেউ পা আকাশের দিকে তুলে হাত দিয়ে হেঁটে চলছিলো। কেউবা লাঠি দিয়ে চাকা চালাচ্ছিলো গাড়ীর মতো করে।

এসব ছাড়াও কেউ কেউ সৈন্যের সাজে সেজেছিলো। কেউ কেউ হাসা-হাসি, চেঁচামেচি করে তালি বাজাচ্ছিলো। কেউবা শিস দিচ্ছিলো।

আবার কেউবা ডিমপাড়া মুরগীর মতো ডাকছিলো।

মোটকথা সব মিলে চারিদিকে ভীষণ হৈ-চৈ। কানে তুলো দেওয়া ছাড়া আর কোনোই গতি নেই যেন। কখন কান দুটো কালা হয়ে যায় কে জানে।

অপরদিকে, পাড়ার ভিতরেই ছিলো থিয়েটারের ব্যবস্থা। ছেলেপেলেদের ভীড় দিন-রাত লেগেই থাকতো সেখানে। দেয়ালের গায়ে পোষ্টারের কায়দায় কয়লা দিয়ে নানারকম অদ্ভুত লেখায় ভরপুর— খ-ল-ন-র জ-য় (খেলনার জয়), অ-ম-র ই-শ-কু-ল চ-ই ন (আমরা ইসকুল চাই না), অ-ক-ম-র-ক (অংক মরুক), এমনি আরো অদ্ভুত অদ্ভুত কথা।

ভণ্ডুল, টেমি ও অন্যান্য ছেলেদের নিয়ে যখন সেই নগরে পা ফেললো, সব দেখে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলো তারা। প্রথম প্রথম একটু কেমন কেমন লাগলেও পরে ওখানকার চলন-ধরনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বেশী বেগ পেতে হোলনা। একে একে সবাই বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো। তখন তাদের চেয়ে সুখী যেন জগতে আর কেউ ছিলো না। এসব নানা খেলাধুলা আর আনন্দের মধ্যে ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, বিদ্যুতের মতো কেটে যেতে লাগলো।

—আহা কি সুন্দর জীবন! টেমির সাথে দেখা হলেই ভণ্ডুল বলে উঠতো একথা।

—দেখলেতো—আমি ঠিক বলেছিলাম না? টেমি বলতো। আর তুমিতো আসতেই চাইছিলে না। ভালো করে ভেবে দেখো একবার কি ভুলই না করতে চেয়েছিলে! পরীর কাছে ফিরে গিয়ে পড়াশুনা করে অনর্থক সময় নষ্ট করতে হতো তোমাকে। হ্যাঁ, আজ ইসকুল আর বই-পত্তর থেকে মুক্তি পেয়েছো একমাত্র এই আমারই জন্যে। আমার পরামর্শে। আমার অনুরোধে। মনে রেখো, কেবলমাত্র প্রকৃত বন্ধুরাই এমন উপকার ও দয়া করতে পারে।

—ঠিক বলছো টেমি। আমি আজ যে আনন্দের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি সেতো তোমারই জন্যে। আর জানো, মাস্টার সাহেব তোমার বিরুদ্ধে কি বলেছিলেন?

—কি?

—আমাকে সব সময় উপদেশ দিয়ে বলতেন—টেমি খুব খারাপ ছেলে।

ওর সাথে মিশোনা কখনো। খুবই দুষ্টু ও। তোমাকে শুধু দুষ্টুমিই শিক্ষা দেবে। খবরদার—সাবধান।

বেচারা মাস্টার! টেমি মাথা নেড়ে বললো। জানি—জানি তিনি আমাকে ঘৃণা করতেন। আমার নিন্দা করবার জন্যে পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। অবশ্য আমি সেজন্যে মনে কিছু করিনি।

—মহাত্মা বটে। বলে ভণ্ডুল টেমিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো।

এমনি করে পাঁচ-পাঁচটা মাস কেটে গেলো। পড়াশুনা নেই, ইসকুলের নামগন্ধ নেই—কতো আনন্দ, কতোই না মজা ওদের! সুখ বেশীদিন থাকে না। ভণ্ডুলেরও রইলো না, অথবা সইলো না বলা যেতে পারে। একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে একটা আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হোল। এজন্যে খুবই মর্মাহত হোল সে।



॥ বত্রিশ ॥

ভণ্ডুল গাধা হয়ে গাধার মতোই ডাকতে আরম্ভ করে।

তোমরা এখন বলো তো, ভণ্ডুল কি আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলো? বলতে পারলে না তো? আচ্ছা, আমিই তোমাদের বলছি!

ঘটনাটা ঘটেছিলো সকালের দিকে। ঘুম থেকে জেগে স্বাভাবিক ভাবে ভণ্ডুল মাথা চুলকাবে বলে যেই হাত তুলেছে অমনি...... বলো তো কি টের পেলো? টের পেলো, তার কান দুটো প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে।

তোমরা জানো যে জন্ম থেকেই পুতুলের কান ছিলো খাটো। যখন

সে টের পেলো রাতের মধ্যেই তার কান, কানতো নয় যেন দুটো পাখা হয়ে গেছে তখন তার পক্ষে অবাক হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় কিছু।

এ কি হোল তার ? অস্থির হয়ে উঠলো পুতুল। তাড়াতাড়ি করে আয়না খুঁজতে গেলো। আয়না না পেয়ে শেষে একটা বালতিতে পানি রেখে তার মধ্যে মুখ দেখতে গিয়ে তো চক্ষু চড়ক গাছ! যা কোনোদিন দেখতে চায়নি তা-ই দেখতে পেলো। তার সুন্দর মুখখানা দুটো গাধার কান দিয়ে সাজানো।

তোমরা ভেবে দেখো ভণ্ডুলের তখন অবস্থাটা কি! দুঃখ, লজ্জা, আর নিরাশা মিলে যেন মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছিলো তাকে। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলো সে। দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকতে লাগলো। কিন্তু যতোই সে ভেঙে পড়ছিলো কান দুটো বাড়তে লাগলো ততোই। কানের গোড়ায় লোম গজাতে লাগলো অনেক।

পুতুলের চেঁচামেচি শুনে একটা মোটা-সোটা বেজী এসে ঢুকলো ঘরে। ওকে অমন অবস্থায় দেখে স্নেহের টোনে জিজ্ঞেস করলো—

—কি হয়েছে তোমার ?

—আমার অসুখ। ভাই বেজী খুব অসুখ আমার। ভীষণ ভয় লাগছে। আচ্ছা, হাত দেখতে জানো ?

—একটু একটু।

—তাহলে দেখতো পরীক্ষা করে—জ্বর-টর হোল কিনা !

বেজী পা তুলে ভণ্ডুলের হাত ধরে নিশ্বাস টেনে বললো—

—বন্ধু আমার, দুঃখের সাথে তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে।

—মানে ?

—তোমার জ্বর। ভয়ানক খারাপ জ্বর এটা।

—কি রকম ?

—গাধার জ্বর।

—এমন জ্বরের নাম তো কখনো শুনিনি। পুতুল বললো। আসলে কিন্তু শুনেছে ঠিকই।

—তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বেজী বললো। তুমি জেনে রেখো ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে তুমি আর পুতুল থাকবে না… …

—কি হবো তবে ?

—তুমি একটা চমৎকার আর প্রকৃত গাধা হয়ে যাবে। গাড়ী টেনে বাজারের মালপত্তর বয়ে বেড়াবে।

—হায় হায় হতভাগ্য আমি! ভণ্ডুল প্রায় চিৎকার করে উঠলো। দুহাতে নিজের কান ধরে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো।

বেজী সান্ত্বনা দিয়ে বললো—

—কেঁদো না। কি করবে কেঁদে? অদৃষ্টে যা হবার তা হয়েছে। অলস ছেলেরা যারা বই, ইসকুল, আর মাস্টার, এদেরকে পছন্দ করে না এবং সারাদিন খেলাধূলা আর আমোদ ফূর্তিতে কাটায় তারা গাধায় পরিণত হয়। এটা অদৃষ্টের লেখা। কারুর হাত নেই এতে।

পুতুল কাঁদ কাঁদ গলায় জানতে চায়—

– এটা কি সত্যি?

—হাঁ, দুঃখের বিষয় সত্যি। এখন কান্নাকাটি করা বৃথা। আগেই তোমার চিন্তা করা উচিত ছিলো।

—কিন্তু আমার কোনোই দোষ নেই এতে। বিশ্বাস করো। সব দোষ হোল গিয়ে টেমির।

– টেমি আবার কে?

– ইসকুলের এক বন্ধু আমার। আমি বাড়ী ফিরে যেতেই চেয়েছিলাম। গুরুজনদের বাধ্য থাকতে চেয়েছিলাম। রীতিমতো পড়াশুনা করতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু টেমিটাই দিলো না আমাকে। ও বললো—

-তুমি ইসকুলে কেনো যে যাও বুঝি না! পড়াশুনা করে কি হবে? তার চেয়ে বরং আমার সাথে খেলাধূলার দেশে চলো। ওখানে পড়াশুনা করবার দরকার হবে না। দিনরাত শুধু আমোদ-ফূর্তিতে কাটাতে পারবে।

—তুমি কেনো ওই দুষ্টু বন্ধুটার পরামর্শ শুনতে গেলে?

– কেনো শুনবো না বলো? পুতুলরা চিরকাল বুদ্ধিশূন্য ও হৃদয়হীন। হায়, আমার যদি সামান্য একটু হৃদয় থাকতো! তবে, যে আমাকে মায়ের মতো হয়ে ভালোবেসেছে সেই সুন্দরী পরীকে কোনোদিনই ত্যাগ করতে পারতাম না আমি। আমার জন্যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হোত না তাকে। আহা, আমি যদি পুতুল না হয়ে আর সব

ছেলেদের মতো হতাম! হায় হায়, টেমিকে আবার কখনো যদি পাই তবে এর উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

এই বলে ভগুল বাইরে যেতে উদ্যত হোল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই মনে পড়লো তার গাধার মত কানের কথা। লোকে বলবে কি! এখন উপায়? অবশ্য উপায় একটা পেয়ে গেলো সে। লম্বা গোছের একটা টুপি মাথায় দিয়ে টেনে নাক পর্যন্ত ঢেকে নিলো। বাইরে গিয়ে ভগুল তন্ন তন্ন করে খুঁজলো টেমিকে। রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায়, থিয়েটারে, এখানে সেখানে কোথাও পাওয়া গেলো না তাকে। যার কাছেই জিজ্ঞেস করা যায়, কোনো খোঁজ-খবর দিতে পারে না কেউ। না পেয়ে শেষে টেমির বাড়ীতেই খুঁজতে গেলো ভগুল। দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়লো—

—কে? ভিতর থেকে টেমি জিজ্ঞেস করলো।

—আমি। পুতুল উত্তর দিলো।

—একটু অপেক্ষা করো। দরজা খুলে দিচ্ছি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে দরজা খোলা হোল। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলো ভগুল। টেমির মাথায় আবার নাক পর্যন্ত টুপি বসানো কেনো! পরক্ষণেই আশ্বস্ত হোল এই ভেবে যে তার বন্ধুকেও তারই মতো একই রোগে ধরেছে। টেমিরও বোধ হয় গাধার জ্বর হয়েছে। সে না দেখার ভান করে হেসে জিজ্ঞেস করলো—

—কেমন আছো টেমি?

—খুব ভালো। একটা পাউরুটির মধ্যে ইঁদুর যেমন থাকে ঠিক তেমন আছি।

—ঠিক বলছো তো?

—নয়তো কি মিথ্যে? মিথ্যে কেনো বলতে যাবো!

—ক্ষমা করো বন্ধু। ঘাট স্বীকার করছি। আচ্ছা, তাহলে নাক পর্যন্ত ওই লম্বা টুপিটা পরেছো কেনো?

—ডাক্তার বলেছে। আমার হাঁটুতে চোট্ লেগেছে কিনা, তাই। আচ্ছা, তোমার মাথায়ও দেখছি আমার মতোই টুপি! তুমি কেনো পরেছো বলো তো?

—ডাক্তার বলেছে! কারণ, আমার পায়ে একটা কাঁটা ঢুকেছে।

—হায় বেচারা ভণ্ডুল।

—হায় বেচারা টেমি!

এসব কথাবার্তার পরে বেশ কিছুক্ষণ ওরা একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কাটালো। অবশেষ পুতুল শান্ত গলায় বন্ধুকে বললো—

—আচ্ছা ভাই, আমার একটু কৌতূহল জাগছে কিন্তু।

—কি?

—তোমার কানে কি অসুখ-বিসুখ হয়নি কখনো?

—কখনোই না। আর তোমার?

—কখনো না। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমার একটা কানে কেমন যেন যন্ত্রণা করছে।

—আমারও ওই একই দশা।

—তোমার ও? কোন্ কানটা দেখি!

—দুটো কানই। আর তোমার?

—দুটো কানই। তাহলে আমাদের দুজনকে কি একই রোগে ধরলো?

—তাই তো মনে হয়। আমার কিন্তু খুব ভয় লাগছে ভণ্ডুল।

—টেমি, আমার কথা শুনবে?

—হ্যাঁ বলো। মনোযোগ দিয়ে শুনবো।

—তোমার কান দুটো আমাকে দেখাবে?

—কেনো দেখাবো না! কিন্তু ভাই ভণ্ডুল, প্রথমে তোমার কান দুটো দেখাতে হবে।

—নাহ্, প্রথম তোমার পালা।

—না আমার নয় বন্ধু। প্রথমে তোমার। তারপর হবে আমার।

—তাহলে ঠিক আছে। পুতুল বললো। এসো আমরা দুজনে চুক্তিবদ্ধ হই।

—কি চুক্তি?

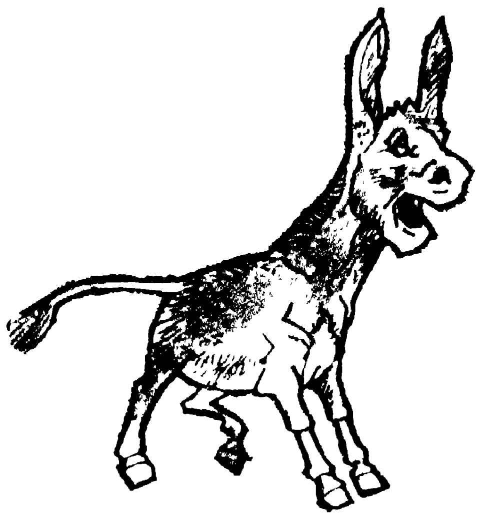
—দুজনে একই সময়ে টুপি তুলে দেবো।

—বেশতো—তাই হোক।

—তাহলে প্রস্তুত?

—হ্যাঁ প্রস্তুত।

ভণ্ডুল তারস্বরে গুনতে আরম্ভ করে দিলো—এক, দুই, তিন। তিন বলার সংগে সংগেই ওরা যার যার টুপি ধরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলো। ঠিক সেই সময়ই আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেলো। চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না। ওদের দুজনেরই একই সর্বনাশ হয়ে গেছে তখন। দুঃখে আর লজ্জায় মরে যায় আর কি। কোনোরকমে নিজেদেরকে সামলিয়ে নিয়ে পরস্পর ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে হো-হো করে হাসতে শুরু করে দিলো ওরা। হাসছে তো হাসছেই। থামাথামির আর কারবার নেই। শেষ পর্যন্ত পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়। হঠাৎ করে হাসি থেমে গেলো টেমির। হোঁচট্ খেয়ে মুখের রঙ গেলো পাল্‌টে। ইনিয়ে-বিনিয়ে বন্ধুকে বললো—



—সাহায্য করো আমাকে সাহায্য করো ভণ্ডুল।

—কেনো, কি হয়েছে তোমার ?

—হায় হায় সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি যে দাঁড়াতে পারছি না।

—আমিও পারছি না। ভণ্ডুল দাপাদাপি করে কেঁদে কেঁদে বললো। বলতে বলতে ওদের দুজনের হাতই মাটিতে আছড়ে পড়লো। তারপর সেই হাত আর পা দিয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। ওদের মুখও লম্বা হয়ে গেলো। পিঠে লোম গজালো ছাই রঙের।

কিন্তু এতোসবের পরও সেই হতভাগা দুটোর সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত কখন এলো জানো ? যখন টের পেলো ওদের পিছনে লেজ ঝুলছে। আহা—হা—হা—হা ওদের তখন দুর্ভোগ দেখে কে ! অদৃষ্টকে দুষে হা-হুতাশ আর কান্নাকাটা ছাড়া আর কোনোই গতি থাকলো না। কি

ভীষণ সর্বনাশ বলোতো! ওদের মুখ থেকে হাহাকার আর কান্নার শব্দগুলো গাধার শব্দ হয়ে বেরুতে লাগলো। এক সংগেই গাধার মতো ডাকতে শুরু করে দিলো—ইঅ-ইঅ-ইঅ।

তক্ষুনি দরজায় ধাক্কা পড়লো। বাইরের থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

—দরজা খোলো। আমি সেই চালক। যার গাড়ীতে চড়ে তোমরা এদেশে এসেছিলে। এক্ষুনি খোলো বলছি। নতুবা তোমাদেরই বিপদ হবে।



॥ তেত্রিশ ॥

গাধা-ভণ্ডুলকে বাজারে নিয়ে একজন সার্কাসের পরিচালকের কাছে বিক্রি করা হয়। হঠাৎ একরাতে গাধাটা খোঁড়া হয়ে গেলে তাকে আরেকজনের কাছে বিক্রি করা হয়। নতুন মালিক এই গাধার চামড়া দিয়ে ঢোল বানাতে চায়।

গলা ফাটিয়ে ডাকছে চালক। ডেকে ডেকে হয়রান। কিন্তু দরজা কেউ খুলছেনা। অবশেষে না পেরে সে সজোরে একটা লাথি কষে দিলো দরজাটায়। দরজা ভেঙে গেলো। তারপর ঘরে ঢুকে ভণ্ডুল আর টেমিকে বললো—

—চমৎকার! ঠিক গাধার মতোই ডাকতে শিখেছো দেখছি। তোমাদের ডাক শুনেই চলে এলাম।

এই কথা না শুনে ওরা লজ্জা পেলো খুব। মাথা নীচু করে, কান নামিয়ে, আর লেজ পায়ের আড়ালে ঢেকে রাখলো।

প্রথমে চালক কাছে গিয়ে ওদেরকে আদর করলো। হাত বুলিয়ে কি যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলো। তারপর একটা ব্রাশ বের করে ওদের সারা গা পরিষ্কার করতে লেগে গেলো। আয়নার মতো চকচকে হলে ওদেরকে মুখে লাগাম লাগিয়ে ভালো দামে বিক্রি করবার মতলব এঁটে বাজারে নিয়ে চললো।

বাজার বেশ জম-জমাট। কাজেই চাহিদার অভাব হোল না। পৌঁছবার সংগে সংগে এক চাষা, যার গাধাটা আগের দিন মরে গেছে - টেমিকে কিনে নিলো। আর সার্কাস দলের এক মহাজন নিলো ভণ্ডুলকে। তার উদ্দেশ্য ছিলো পোষ মানাবে। নাচ-গান শিখাবে। যাতে করে অন্যসব দলের পশুদের চেয়ে সুনাম কিনতে পারে।



আমার ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকারা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে সেই চতুর চালক কেমন সুন্দর ব্যবসায়ী বুদ্ধিটাই না খাটালো। এই জঘন্য রাক্ষসটি হাসি-খুশীর চেহারা ধরে মাঝে মাঝে একটা গাড়ী নিয়ে গ্রামে গ্রামে যেতো। আর পথে যতোসব অলস ও দুষ্টু ছেলে যারা ইসকুল আর বইকে ফাঁকি দিতে চাইতো তাদেরকে আদর-সোহাগ করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের গাড়ীতে তুলে খেলাধূলার দেশে নিয়ে যেতো। যাতে করে খেলায়, ফুর্তিতে, আর দুষ্টুমিতে তাদের

ভবিষ্যৎ জীবন ঘোলাটে হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর যখন সেই হতভাগ্য ছেলেরা পড়াশুনা না করে শুধু খেলা করে করে গাধা হয়ে যেতো তখন খুশীতে উছলে পড়তো সে। সবাইকে ধরে ধরে বাজারে অথবা মেলায় বিক্রি করে দিতো।

এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে সেই চালক প্রচুর পয়সা জমিয়ে ফেললো। টাকার কুমীর হয়ে বিরাট একজন মহাজন বনে গেলো।

টোমির কি হোল আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে ভণ্ডুল শুরু থেকেই একটা খুব পরিশ্রমী আর কঠিন জীবনধারণ করে এসে-ছিলো। মালিক তাকে গাধার ঘরে থাকতে দিলো। আর খেতে দিলো কতকগুলো বিচালী। কিন্তু ভণ্ডুলের পক্ষে খাওয়া সম্ভব হোল না তা। একবার খেয়ে আবার থুথু করে ফেলে দিলো সে।

মালিক তো রেগেই লাল। বিচালীর পরিবর্তে ঘাস খেতে দিলো। কিন্তু তা-ও নাপছন্দ ভণ্ডুলের।

এবারে মালিক রেগে-মেগে চিৎকার করে উঠলো—

—হায়রে কপাল, ঘাসও পছন্দ হয়না! দেখি কি খাও তুমি! অ্যাঁ, মাথায় গোলমাল নেই তো? রাখো খুঁজে দেখছি।—এই বলে চাবুক দিয়ে সপাং সপাং পিটাতে শুরু করে দিলো। ভণ্ডুল ভীষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে কাঁদতে লাগলো। আর ডাকতে আরম্ভ করলো অবিকল গাধার মতোই।

—ইঅ-ইঅ। আমি বিচালী হজম করতে পারি না।

—তাহলে ঘাস খাও। মালিক বললো গাধার ভাষায়। কারণ, ঐ ভাষা জানা ছিলো তার।

-ইঅ-ইঅ। ঘাস খেলে পেটে ব্যথা করে আমার।

তাহলে তোমার মতো একটা গাধাকে মুরগী আর খাসী খেতে দিতে হবে নাকি! মালিক বললো আরো বেশী রেগে। তারপর আবার চাবুক লাগালো।

এই দ্বিতীয়বার চাবুক খেয়ে ভণ্ডুল সাবধান হয়ে গেলো। কোনো কথা না বলে একদম চুপচাপ রইলো।

ইতিমধ্যে গাধার ঘরটা গেলো বন্ধ হয়ে। ভণ্ডুল একাই রয়ে গেলো সেখানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো। কিছুই খেতে পেলোনা

সে। খিদের জ্বালায় শুধু হাই তুলতে লাগলো।

কি আর করে ভণ্ডুল। অবশেষে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঘাস খেতে শুরু করে দিলো। খুব ভালো করে চিবিয়ে চোখ বন্ধ করে কোনোরকমে গিলতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো—

—নেহাত খারাপ লাগছে না খেতে। কিন্তু কতোই না ভালোছিলো যদি পড়াশুনা করতাম। এখন ঘাস খেতে আর হোতনা। অন্তত দুটো ভাত-তরকারি জুটতো।

পরদিনও ঘুম থেকে জেগে খেতে পেলোনা ভণ্ডুল। সামান্য এক আধটুকু ঘাসও নেই। গত রাতেই খেয়ে সাফ করে ফেলেছে সব। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু বিচালী বেছে নিলো।

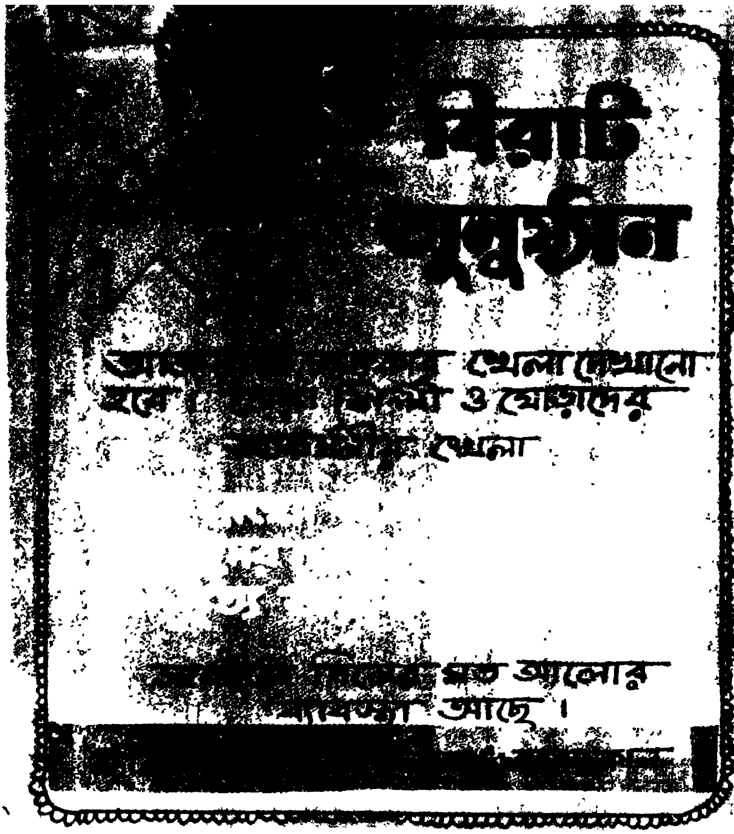
কিন্তু বিচালী কি খাওয়া যায়? দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? কোথায় ভাত-তরকারি আর কোথায় এই বিচালী।

—যাক, কি আর করা যাবে! ভণ্ডুল বললো বিচালী চিবোতে চিবোতে। আমার এই দুর্দশা অন্যসব অবাধ্য এবং অলস ছেলেদের উপকারে আসবে। ধৈর্য ও সহ্য থাকা ভালো।

—সহ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই মুহূর্তে গাধার ঘরে প্রবেশ করে মালিক চেঁচিয়ে উঠলো। কি মনে করো তুমি? শুধু বসে বসে খাবার জন্যেই তোমাকে কেনা হয়েছে নাকি। ওসব বুঝি না। কাজ না করলে চলবে না। আমি অনেক অনেক টাকা-পয়সা রোজগার করতে চাই। এখন থেকে ভালোভাবে কাজ-কাম করো। আর হ্যাঁ, আমার সংগে সার্কাসে চলো। ওখানে গিয়ে চাকার ভিতর দিয়ে কেমন করে লাফাতে হবে, মাথা দিয়ে কেমন করে কলসি ভাঙতে হবে, কেমন করে পিছনের পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, তোমাকে সব কিছু শিখিয়ে দেবো।

বেচারা ভণ্ডুলকে আর বৃথা আপত্তি না জানিয়ে ওই সমস্ত চমৎকার কসরৎ শিখতে হোল। কিন্তু সময় লেগে গেলো প্রায় তিন মাস। এরই মধ্যে কতো চাবুকই না পড়েছে পিঠে।

অবশেষে দিন এলো ফিরে। ভণ্ডুলের মালিক একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। প্রচারপত্র ছড়ালো চারদিকে। বিচিত্র লেখা দিয়ে ভরপুর সেগুলো। এখানে ওখানে লটকিয়ে দেওয়া হোল।



তোমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারো সেই রাতের অবস্থা। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার ঘণ্টাখানেক আগে গোটা হলটাই পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। সোনা দিয়েও একটা চেয়ার অথবা বসবার ব্যবস্থা করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।

সার্কাসে ভীষণ ভীড়। সব রকম বয়েসী লোকের সমাগম সেখানে। খ্যাতনামা গাধা-শিল্পী ভণ্ডুলকে দেখবার জন্যে সবাই অস্থির হয়ে উঠলো।

অনুষ্ঠান শুরু হোল। দলের পরিচালকের একটা সাদা কোট ও সাদা প্যাণ্ট পরনে। হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো। সে দর্শকদের বিরাট ভীড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করে দিলো।

—গণ্যমান্য দর্শকবৃন্দ! আমি একজন গরীব। আপনাদের গ্রামে এসে খুবই আনন্দিত। কেনো যে এসেছি একথা আপনাদের অজানা নয়। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী গাধা ভণ্ডুল আজ আপনাদের সামনে নাচ দেখাবে।

সে রাজা এমন কি মহারাজাদের সামনেও নেচেছে। যদি কোনো ভুলত্রুটি হয় ক্ষমার চোখে দেখবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অনেক হাসাহাসি আর হাততালির ভিতর দিয়ে বক্তৃতার শেষ হোল। তারপর যখন ভণ্ডুলকে সেই সার্কাসের মধ্যে দেখা গেলো, হাততালি শুরু হয়ে গেলো আবার। যেন একটা ঝড় বয়ে গেলো গোটা সার্কাসের উপর দিয়ে।

ভণ্ডুলকে সাজানো হয়েছে অপরূপ সাজে। পরিচালক আবার এসে শিল্পীর পরিচয় দর্শকদের জানিয়ে দিলো।

—গণ্যমান্য দর্শকবৃন্দ! ওই যে গাধাটাকে দেখছেন। অতি কষ্টে জংগল থেকে ধরে এনে পোষ মানানো হয়েছে। আমি মিথ্যা বলছি না এতোটুকুও। অনুরোধ করছি—দেখুন। তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। যেন কতোই না আগুন ছিট্‌কে পড়তে চাইছে। ওকে সভ্যতা শিখাতে গিয়ে বারবার চাবুক ব্যবহার করতে হয়েছে আমাকে। এই দুর্ব্যবহারেও সে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়নি। বরং আরো ভালোবেসে ফেলেছে আমাকে। তাকে নাচতে শিখালাম। মাথা দিয়ে কেমন করে কলসি ভাঙতে হয় তা শিখালাম। চাকার ভিতর দিয়ে কেমন করে লাফাতে হবে তা-ও শিখানো হয়েছে। দেখে আপনারাই বিচার করুন।

—এই বলে পরিচালক মাথা নীচু করে সালাম জানিয়ে ভণ্ডুলের দিকে ফিরে বললো—

—ভয় নেই ভণ্ডুল। তোমার খেলা শুরু করে দাও। তার আগে এই গণ্যমান্য দর্শক, নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে সবাইকে সালাম জানাও।

বাধ্য হয়ে ভণ্ডুল তার সামনের পা দুটো বাঁকা করে হাঁটু পেতে মাটিতে বসে থাকলো, যে পর্যন্ত পরিচালক তাকে তালে তালে চলতে নির্দেশ না দিলো।

গাধা চার পায়ে দাঁড়িয়ে তালে তালে চলছে। একটু পরেই পরিচালক চিৎকার করে উঠলো—

দৌড়াও।

ভণ্ডুল হুকুম পেয়ে দৌড়াতে লাগলো।

—হামাগুড়ি দিয়ে চলো!

ভণ্ডুল পরিচালকের কথা মতোই কাজ করলো।



—তাড়াতাড়ি চলো!

ভণ্ডুল তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো।

গাধা ছুটছে। কিছুক্ষণ পর পরিচালক আকাশের দিকে হাত তুলে পিস্তলের গুলি ছুঁড়লো। সংগে সংগে ভণ্ডুল আহত হবার ভান করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর অসাড় হয়ে একভাবেই পড়ে রইলো। যেন সত্যিই মরে গিয়েছে সে।

ওদিকে দর্শকদের হাততালি, আনন্দ আর কলরবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভণ্ডুল স্বাভাবিকভাবে মাথা তুলে তাকালো। হঠাৎ চোখ পড়ে গেলো গ্যালারীতে বসা সুন্দরী একটা মেয়ের দিকে। তার গলায় একটা সোনার হার। হীরের লকেটটায় মস্তবড় একখণ্ড মণি ঝুলছে। সেই মণির মধ্যে একটা পুতুলের ছবি।

—আরে, ও যে আমারই ছবি! মেয়েটা আমার পরী-মা নিশ্চয়ই। তাকে চিনতে পেরে ভণ্ডুল মনে মনে বলছিলো। তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো—পরী-মা, পরী-মা আমার।

কিন্তু কণ্ঠস্বর গেলো পাল্টে। মানুষের পরিবর্তে গাধার স্বর বের হোল গলা থেকে। দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠলো। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

তখন পরিচালক ভণ্ডুলকে সভ্যতার সীমা ছাড়াতে নিষেধ করলো। সবার সামনে অমন করে ডাকাডাকি উচিত নয় সে কথা বুঝাতে গিয়ে চাবুক মেরে দিলো তার নাকে। চাবুক খেয়ে বেচারা গাধা জিভ বের করে প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চাটলো। যাতে করে ব্যথার কিছুটা উপশম হয়। কিছুক্ষণ পরে যখন মাথা তুলে দেখলো তার পরী-মা উধাও হয়ে গেছে, তখন সে আবার ভেঙে পড়লো। মনে মনে ব্যথা পেলো খুব। চোখ দুটো পানিতে টইটুম্বুর হয়ে উঠলো। আর কাঁদতে শুরু করে দিলো। কিন্তু কেউ তা টের পেলো না। এমন কি পরিচালকও বুঝতে পারলো না কিছু। সে চাবুকটা বার কয়েক ঘুরিয়ে শব্দ করে চিৎকার করে উঠলো—

—কোনো ভয় নেই ভণ্ডুল। সবাইকে দেখাও, কি কায়দায় চাকার ভিতর দিয়ে লাফালাফি করতে হয়।

দু-তিনবার চেষ্টা করলো ভণ্ডুল। কিন্তু পারলো না। যখনি সে চাকার

সামনে আসতো তখনি কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যেতো। চাকার ভিতর দিয়ে না গিয়ে নীচে পড়ে যেতো।

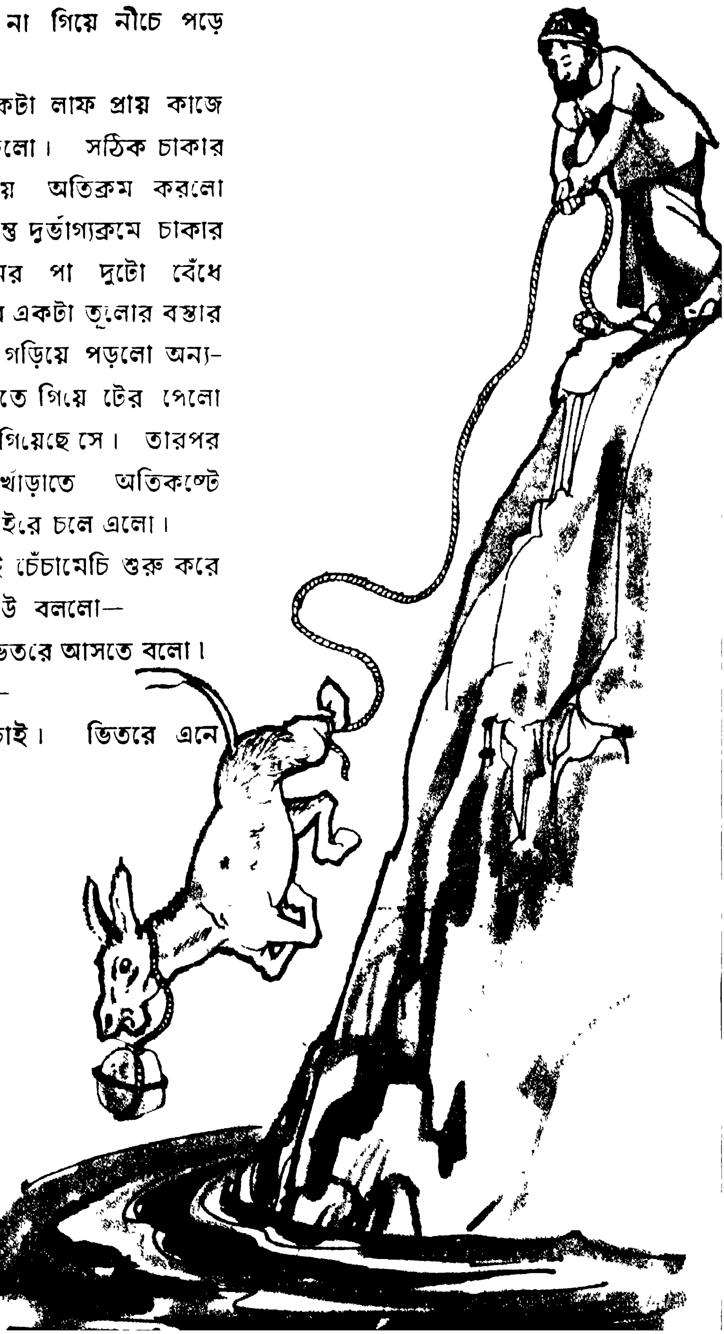
শেষকালে একটা লাফ প্রায় কাজে এসে গিয়েছিলো। সঠিক চাকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলো ঠিকই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চাকার সংগে পিছনের পা দুটো বেঁধে গেলো। আর একটা তুলোর বস্তার মতোই গিয়ে গড়িয়ে পড়লো অন্য-দিকে। দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলো খোঁড়া হয়ে গিয়েছে সে। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে অতিকষ্টে সার্কাসের বাইরে চলে এলো।

এদিকে সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। কেউ বললো—

—ভণ্ডুলকে ভিতরে আসতে বলো।

কেউ বললো—

—গাধাকে চাই। ভিতরে এনে দাও ওকে।



ছেলেমেয়েদের সোরগোলের তো কথাই নেই। সবাই মিলে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিলো।

সেই রাতে আর গাধাকে দেখা গেলো না। পরদিন পশু-ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করলো যে, সারাটা জীবনই গাধাকে খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে। তখন পরিচালক তার রাখালকে বললো—

—খোঁড়া গাধাটা আর কি কাজে আসবে। ওকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দিতে পারবো না। বরং এক কাজ করো—ওকে বাজারে নিয়ে যাও। ভালো দামে বিক্রি করে দাও।

বাজারে গিয়েই একটা খরিদ্দার জুটে গেলো। সে রাখালকে জিজ্ঞেস করলো—

—তোমার ওই খোঁড়া গাধাটার দাম কতো?

—একশ' টাকা।

—এই নাও একশ' টাকা। ওকে আমাকে দিয়ে দাও। ভেবো না ওকে আমি কাজে লাগানোর জন্যে কিনছি। শুধু চামড়াটাই দরকার। চামড়াটা বেশ শক্ত বলেই মনে হচ্ছে। ওটা দিয়ে আমি একটা বড় ঢোল তৈরী করবো। এমনি একটা ঢোলের শখ আমার অনেক-দিন থেকেই।

তোমরা ভেবে দেখো ভণ্ডুলের অবস্থাটা তখন কি! যখন শুনলো তার চামড়া দিয়ে ঢোল তৈরী করা হবে, প্রাণ শুকিয়ে এতোটুকুন হয়ে গেলো তার।

যাহোক, লোকটা টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে গাধাকে সোজা সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেলো। আর গলায় একটা ভারী পাথর বেঁধে পায়ে দড়ি লাগিয়ে ধাক্কা মেরে পানির মধ্যে ফেলে দিলো।

তার পরের ঘটনা তো বুঝতেই পারছো তোমরা। ভণ্ডুল ধাক্কার চোটে পানিতে পড়ে গেলো। আর ধীরে ধীরে পানির গভীরে তলিয়ে গেলো। এদিকে মালিক দড়িটা শক্ত করে ধরে তীরে বসে রইলো গাধাটা মরে যাবে সেই প্রতীক্ষায়। মরে গেলেই তার গায়ের চামড়া তুলে নেবে। নিজের জন্যে বেশ সুন্দর দেখে বড়সড় একটা ঢোল বানিয়ে নেবে।

।। চৌত্রিশ ।।

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত গাধা-ভণ্ডুল আবার আগের মতোই পুতুল হয়ে যায়। কিন্তু সাঁতার কাটা অবস্থায় প্রকাণ্ড একটা মাছ তাকে গিলে ফেলে।

অমনি করে কেটে গেলো প্রায় মিনিট পঞ্চাশেক। লোকটা মনে মনে বললো

—এতোক্ষণ বেচারা খোঁড়া গাধাটা নিশ্চয়ই মরে গেছে। ওকে তুলে নিই। ওর চামড়াটা দিয়ে কি সুন্দরই না ঢোল তৈরী হবে! এই বলে সে গাধার পায়ের সংগে বেঁধে দেওয়া সেই দড়ি ধরে টানতে লেগে গেলো।

টানছে। টানছে। টানছে।

অবশেষে পানির উপরে কাকে দেখা গেলো বলোতো? মৃত গাধার বদলে একটা জীবন্ত পুতুল। মাছের মতোই দাপাদাপি করছিলো সে। লোকটাতো অবাক! ব্যাপারখানা কি! সে স্বপ্ন দেখছে নাতো? একেবারে পাথরের মতো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখ খোলা। চোখ দুটো যেন মাথার বাইরে। জ্ঞান ফিরে এলে তোতলাতে তোতলাতে বললো—

- গাধাটাকে সাগরে ফেলে দিলাম। অথচ সে গেলো কোথায়!

—সেই গাধাই আমি। পুতুল হেসে উত্তর দিলো।

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি।

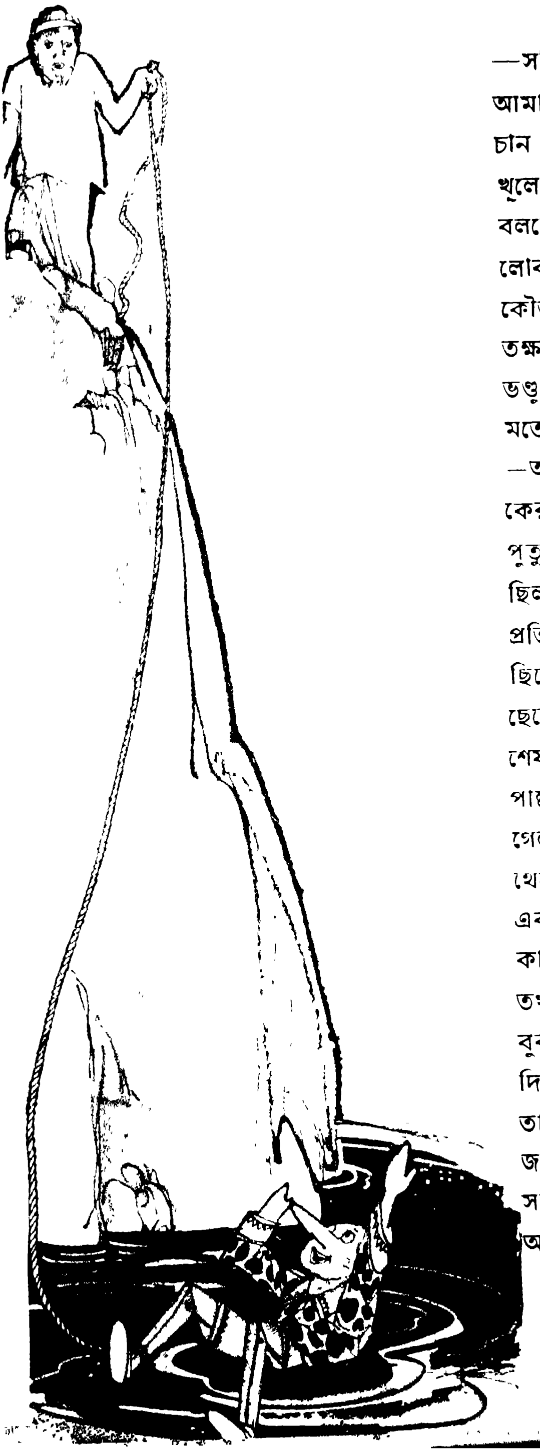
—ওরে বদমায়েস! আমার সংগে ঠাট্টা?

—না না, ঠাট্টা করতে যাবো কেনো! আমি ঠিকই বলছি।

—ঠিক বলছো মানে? একটু আগেই তো গাধা ছিলে! হঠাৎ পানির ভিতরে থেকে কাঠের পুতুল হয়ে গেলে কি করে!

—সম্ভবত এটা সমুদ্রের লোনা পানিরই ফল। সমুদ্র সময় সময় এমন লীলা খেলা দেখিয়ে থাকে।

—সাবধান পুতুল, সাবধান! আমার সংগে ঠাট্টা! এ আমি সইবো না কিছুতেই। একবার ধৈর্য হারালে কিন্তু আর রক্ষে নেই।



—সত্যি সত্যিই যদি আপনি আমার প্রকৃত ইতিহাস জানতে চান তবে দয়া করে আমার পা খুলে দিন। আমি সব কথাই বলবো আপনাকে। সেই বোকা লোকটি ভণ্ডুলের ইতিহাস জানবার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তক্ষণি দড়ি খুলে দিলো। এবারে ভণ্ডুল নিজেকে একটা বুনো পাখীর মতো মুক্ত মনে করে বললো—

—আপনি হয়তো জানেন না আজ-কের মতোই পূর্বেও আমি কাঠের পুতুল ছিলাম। খুব ভালো ছেলেই ছিলাম আমি। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি চিরকালই আমার অনিচ্ছা ছিলো। আসলে আমার দলের ছেলেরা তেমন ভালো ছিলো না। শেষ পর্যন্ত ওই সব দুষ্টু ছেলেদের পাল্লায় পড়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি, আমি একটা গাধা হয়ে গেছি। যার লম্বা কান, আর লম্বা লেজ। আমার তখন যে কি লজ্জা তা কি করে বুঝাবো আপনাকে। জীবনে কোন-দিন যেন আর অমন না হয়।

তারপর আমাকে বিক্রি করবার জন্যে বাজারে নিয়ে গেলে একজন সার্কাসের মালিক কিনে নিলো আমাকে। সে ভেবেছিলো আমি

একটা ভালো নাচুয়ে। আর অনেক রকম খেলাধুলার কেরামতি দেখাতে পারবো। কপাল মন্দ। তাই একরাতে খেলা দেখাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে আমার দুটো পা-ই খোঁড়া হয়ে গেলো।

এরপর এলো আরো দুঃখের পালা। আমাকে দিয়ে কোনো কাজই হবে না ভেবে মালিক আবার বাজারে পাঠিয়ে দিলো। সেখান থেকে আপনি আমাকে কিনে নিয়ে এলেন।

—তাইতো, তাইতো। কিন্তু তখন তোমার জন্যে পুরোপুরি একশ' টাকার একখানা নোট দিতে হয়েছিলো। এখন আমাকে কে দেবে সেই টাকা?

—কেনো কিনে নিয়েছিলেন আপনি? আমার চামড়া দিয়ে একটা ঢোল তৈরী করবেন, এই তো? একটা ঢোল, তাই না?

— তাইতো, তাইতো! এখন আবার চামড়া পাই কোথায়!

—কোনো চিন্তা করবেন না প্রভু। এ জগতে অনেক গাধাই আছে

—অসভ্য। তোমার ইতিহাস কি এখানেই শেষ?

—না। পুতুল উত্তর দিলো। আরো দুটো কথা আছে। তারপরেই শেষ। কিনবার পরে আমাকে এখানে আনা হোল খুন করবার জন্যে। কিন্তু পরে দয়া করে তা না করে গলায় একটা পাথর বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোল। এই দয়ার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো আপানার কাছে। অপরদিকে, আমার পরী-মায়ের মতোই উপকার করছেন আপনি।

—পরী আবার কে?

—সে আমার মা। মায়ের মতোই মা। নিজের ছেলেমেয়েকে খুবই ভালোবাসেন তিনি। তাদের উপর সব সময় নজর রাখেন। আর যে-কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। ছেলেমেয়েরা যখন দুষ্টুমি করে, বদমায়েসী করে, এবং ত্যাজ্যপুত্র হয়ে অসহায়ের মতো ঘুড়ে বেড়ায় তখনো তাদের রক্ষা করেন তিনি। তাই আমার সুন্দরী পরী-মা যখন দেখেছেন আমি পানিতে ডুবে মরে যাচ্ছি, অনেক অনেক মাছ আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওরা এসে গাধাকে মৃত মনে করে খেতে আরম্ভ করলো। ওরা কিন্তু খুব লোভী। কেউ কান খেলো, কেউ কেউ মুখ, কেউবা যারা ছোট এবং দুষ্টু প্রকৃতির, তারা আমার লেজটাও খেয়ে ফেললো।

কথাগুলো শুনে লোকটার ঘৃণা হোল খুব। সে নাক সিটকিয়ে বলে উঠলো—

—আজ থেকে দিব্যি করে বলছি, আর কোনদিন মাছ খাবো না আমি। কি জানি মাছ খেলে হয়তো তার পেটের ভিতরে গাধার লেজ পাবো।

—আমিও আপনার মতোই ভাবছি। পুতুল হেসে বললো। আবার একথাও ঠিক, মাছেরা কিন্তু গাধার খোলসটাও খেয়ে ফেলেছে। খেতে খেতে হাড় পর্যন্ত বের করে তারপরে ছেড়েছে। হাড় ঠিক নয়, কাঠ পর্যন্ত। কারণটা আপনি স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একটা কঠিন কাঠের তৈরী। শেষ পর্যন্ত ছোবল মেরে মেরে যখন সেই লোভী মাছগুলো বুঝতে পারলো ওদের দাঁতে আর সম্ভব নয়, একে একে সবাই কেটে পড়লো তখন।

—দূর দূর! এসমস্ত গল্প আমি বিশ্বাস করি না। আমি শুধু জানি, একশ' টাকা খরচ করেছি। সে টাকা আমার ফেরত চাই। নইলে কি করবো জানো? আবার বাজারে নিয়ে গিয়ে উনুনের জ্বালানী কাঠের মতো তোমাকে বিক্রি করে দেবো।

—বেশতো তাই করুন। আবার আমাকে বিক্রি করে দিন। আমি একদম রাজী। ভণ্ডুল বললো। আর সংগে সংগে চমৎকার এক লাফে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আনন্দে তীর থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে সাঁতার কেটে যেতে যেতে সেই বেচারা প্রভুকে চিৎকার করে বললো—

—সালাম প্রভু। ঢোলের চামড়ার প্রয়োজন হলে আমাকে স্মরণ করবেন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আরো জোরে চিৎকার করে বললো—সালাম প্রভু। জ্বালানী কাঠের দরকার হলে আমাকে বলবেন। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেলো ভণ্ডুল। ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিলো না তাকে। দূর থেকে ছোট একটা মাছের মতোই পানির উপরে ওঠানামা করতে দেখা গেলো শুধু।

সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ভণ্ডুল। সহসা দূরে সমুদ্রের মধ্যে মার্বেল পাথরের মতো সাদা একটা পাহাড় নজরে ভেসে এলো ওর। সেই পাহাড়ের উপরে একটা সুন্দর ছাগলকেও দেখা গেলো। সে চিৎকার করে ভণ্ডুলকে তার কাছে যেতে অনুরোধ করছিলো।

আশ্চর্য! ছাগলটার চামড়া অন্যসব ছাগলের মতো সাদা কিম্বা কালো কোনোটাই নয়। তার চামড়ার রঙ ছিলো নীল। তাকে দেখে সেই সুন্দরী মেয়ের চুলের কথা মনে পড়ে গেলো ওর।

তোমরা বুঝতেই পারছো ভণ্ডুলের কি অবস্থা তখন। বুকে রীতিমতো ধক্-ধক্ শব্দ শুরু হয়ে গেছে। তার শক্তিও কমে গেছে অনেক। কোনো রকমে সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

প্রায় আধাআধি পথ এসে গেছে ভণ্ডুল। তখন হঠাৎ পানির উপরে সমুদ্রের রাক্ষসের একটা ভয়ংকর মাথা ভেসে উঠতে দেখা গেলো। তার মুখখানা দেখতে একটা বড় ধরনের ঘরের মতো। তিন সারি দাঁতের পাটি। দৈত্যের মতো চেহারা। ভণ্ডুলের দিকে এগিয়ে আসছিলো ভয়ানকভাবে।



এই সমুদ্রের রাক্ষস কে তোমরা জানো? সেই বড় মাছ। যার কথা এই কাহিনীতে আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি। তার হিংস্রতার জন্যে এবং অত্যাচারের জন্যে সে এই অঞ্চলে বিখ্যাত।

বেচারা ভণ্ডুল সেই রাক্ষস দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। অন্যপথ ধরে চলতে লাগলো। মোটকথা, পালাবার সব রকম পন্থাই অবলম্বন করলো। কোনো ফল হোল না। সেই প্রকাণ্ড মাছটা সব সময় তার দিকে তীরের বেগে ধেয়ে আসতে লাগলো।

— তাড়াতাড়ি ভণ্ডুল!

ভণ্ডুল প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েই সাঁতার কাটছিলো। বুক দিয়ে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে যথাসাধ্য এগিয়ে চলছিলো।

— জলদি ভণ্ডুল! রাক্ষস কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ভণ্ডুল আরো জোরে এগুতে লাগলো।

—সাবধান ভণ্ডুল! রাক্ষস একেবারে কাছাকাছি। এইতো হেরে গেলে তুমি।

ভণ্ডুল তখন এক রকম বেহুঁশ। বন্দুকের গুলির মতো দ্রুতবেগে সাঁতার কাটতে লাগলো। আর প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছালো। ছাগলটা তার পা দুটো এগিয়ে দিলো ভণ্ডুলকে ধরে তুলবার জন্যে। কিন্তু দেরী হয়ে গেলো। সেই রাক্ষস ভণ্ডুলকে ধরে একটা ডিমের মতো করে খেয়ে ফেললো। এত জোরে গিললো যে পেটের মধ্যে গিয়ে ভণ্ডুল প্রায় পনেরো মিনিট পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো।

জ্ঞান ফিরে এলো বটে, কিন্তু ভণ্ডুল বুঝতেই পারলো না সে কোথায়। বুঝবে কি করে? চারিদিকে বিরাট অন্ধকার। এতো গভীর আর কালো অন্ধকারে একটা কালির দোয়াতের মতো মনে হচ্ছিলো নিজেকে। কান পেতে রইলো। কিন্তু কোনো রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না কোথাও। কেবল মাঝে মাঝে তার মুখে একটা ভীষণ বাতাস এসে লাগছিলো। কোথা থেকে এই বাতাসটা আসছে প্রথমে বুঝা গেলো না ঠিক। পরে ধরা পড়লো সেই বাতাস রাক্ষসের ফুস ফুস থেকে বের হয়ে আসছে। তার কারণও রয়েছে। মাছটার ছিলো হাঁপানি রোগ। যখন সে শ্বাস টানতো, তখন মনে হোত দক্ষিণা বাতাস বইছে।

তবুও ভণ্ডুল একেবারে হতাশা হোল না। নিজেকে একটু সাহস দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু যখন প্রমাণ পেলে যে সে রাক্ষসের পেটে বন্দী তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলোনা। কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পড়লো।

—হায়, হায়, হায়! আমাকে কি কেউ সাহায্য করতে আসবে না?

—বদমায়েস, কে তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে এখানে। সেই বিশাল অন্ধকারের মাঝে ভাঙা কলসীর মতো একটা অদ্ভুত গলা বেজে উঠলো।

ভণ্ডুল তো ভয়ে একেবারে ঠাণ্ডা। তবুও কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলো—

—কে—কে তুমি আবার আমার সাথে কথা বলছো?

—আমি। একটা বেচারা রুই মাছ। রাক্ষসটা আমাকেও গিলে ফেলেছে। তুমিও কি মাছ?

—না। মাছদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটা পুতুল।

—মাছই যদি না হবে তবে কেনো এই রাক্ষসের পেটে এসেছো?

—আমি আসিনি। রাক্ষসটা আমাকে গিলে ফেলেছে। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে কি যে করি।

—কি আর করবে। সব কিছুই সহ্য করে যেতে হবে যে পর্যন্ত এই রাক্ষস-মাছ আমাদের হজম না করে ফেলে।

—কিন্তু আমি যে হজম হতে চাই না। ভণ্ডুল চিৎকার বলে ওঠে এবং দুহাতে মুখ ঢেকে কান্না জুড়ে দেয়।

রুই মাছ বলে,

—আমিও চাই না। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। আমি রুই মাছ হয়ে জন্মেছি। টিনের মধ্যে পঁচে গলে মরার চেয়ে এভাবে মরাই ভালো। এটাই আমার বড় সান্ত্বনা।

—ওসব বাজে কথা। ভণ্ডুল প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো।

—আমারও ওই একই কথা! রুই মাছ উত্তর দিলো।

—দূর দূর! পুতুল বললো। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। সোজা কথায় আমি পালাতে চাই।

—বেশতো, পারো যদি পালাও।

পুতুল জিজ্ঞেস করলো—

—আমরা যার পেটে আছি এই মাছটা কি অনেক বড়?

—এর দেহটা লেজ বাদেই এক মাইল। এখন চিন্তা করে দেখো কতো বড়।

কথা বলছে বলছে হঠাৎ ভণ্ডুল দূরে—বহুদূরে আলোর মতো কি যেন দেখতে পেলো। সে বললো—

—ওই যে দূরে আলোর মতো ওটা কি?

—আমাদের মতোই একজন। সেও আমাদের মতো হজমের অপেক্ষা করছে।

—আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। কিজানি কোনো বুড়ো মাছ-টাছও হতে পারে। হয়তো আমাকে পালাবার পথ বলে দিতে পারবে।

—প্রিয় পুতুল ! বেশতো যাও না। আমি তোমাকে অন্তর থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

—ধন্যবাদ রুই মাছ।

—ধন্যবাদ। তোমার আশা পূর্ণ হোক।

—কোথায় দেখা পাবো আবার ?

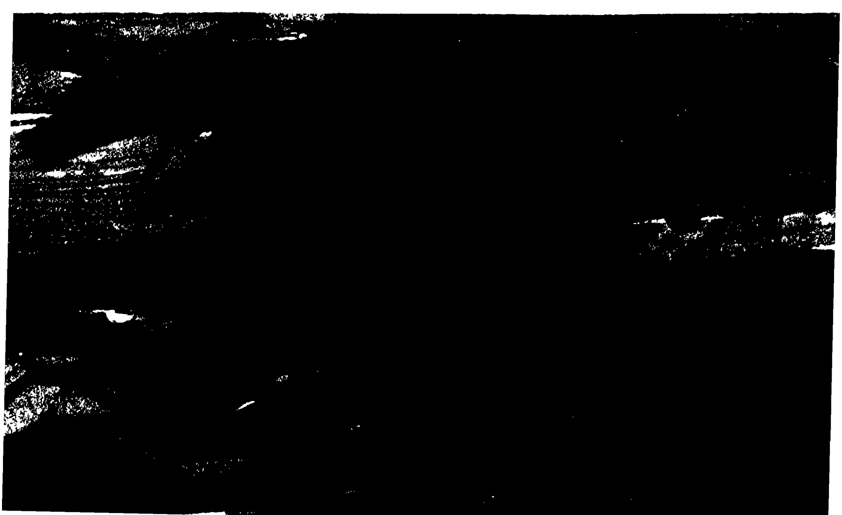
—কি জানি এ ব্যাপারে চিন্তা না করাই ভালো।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

ভণ্ডুল সেই আলোর কাছে গিয়ে কাকে পায়? এই অধ্যায় পড়ে তা তোমর বুঝতে পারবে।

ভণ্ডুল তার বন্ধু রুই মাছের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে এক পা এক পা করে কোনো রকমে সেই দ্বীপের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারলো তার পা ঘোলাটে পানির ভিতর দিয়ে চলছে। আবার সেই পানি থেকে সিদ্ধ মাছের গন্ধ ভেসে আসছে।

যতোই এগিয়ে যাচ্ছে ভণ্ডুল, আলোটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ততোই। অবশেষে সেখানে পেঁাছে কি দেখলো জানো ? হাজার হাজার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেও তোমরা বলতে পারবে না। দেখলো, সাজানো গোছানো ছোট্ট একটা টেবিল। তার উপরে রয়েছে একটা সবুজ কাঁচের বোতল।



বোতলের উপরে আবার একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। আর টেবিলটার সামনে বসা দুধের মতো সাদা একজন বুড়ো। সে ছোট ছোট জীবন্ত মাছগুলো ধরে ধরে খাচ্ছিলো। একেবারে জ্যান্ত। খেতে গিয়ে কয়েকটা মাছ পালিয়েও গেলো।

সেই দৃশ্য না দেখে ভণ্ডুলের তো চক্ষুস্থির! একি বিদঘুটে কাণ্ড! লাটিমের মতো মাথাটা ঘুরে ঘুরে হঠাৎ পাগলের মতো হয়ে গেলো সে। একবার হাসে, একবার কাঁদে। হাজার হাজার কথা বলে যাচ্ছে যার কোনো মানে মতলব নেই। অথচ বলেই যাচ্ছে।

অবশেষে সেই বুড়োর গলাটা জড়িয়ে ধরে পুতুল চিৎকার করে উঠলো।
—ওরে বাবা আমার। ভাগ্যক্রমে আপনাকে পেয়ে গেছি আজ। এখন আর ছাড়ছি না।
—আমি ভুল দেখছি না তো! বুড়ো চোখ মুছতে মুছতে বললো। তাহলে তুমি কি আমার সেই আদরের ভণ্ডুল?
—হ্যাঁ আমি বাবা। সত্যিই আমি। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন? ওরে বাবা আমার, কতো ভালো আপনি। আর আমি তার বিনিময়ে......।

আহা, আপনি যদি জানতেন—আমার উপর দিয়ে কতো বিপদ, কতো ঝড় বয়ে গেছে! আর জীবনে কত সর্বনাশই না ঘটেছে! নিজেই চিন্তা করে দেখুন আমার জন্যে কতোখানিই না করেছেন আপনি। নিজের গায়ের কোট বিক্রি করে দিয়ে আমার বই কিনে দিয়েছেন। যাতে আমি



ইসকুলে যাই। রীতিমতো পড়াশুনা করি। আর আমি? আমি সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে গেলাম পুতুল খেলা দেখতে। পুতুল খেলোয়াড় আমাকে আগুনে জ্বালাতে চেয়েছিলো তার খাসি সিদ্ধ করবে বলে। পরে দয়াপরবশ হয়ে সে আমাকে পাঁচটা সোনার মোহর দিয়েছিলো আপনাকে দেবার জন্যে। কিন্তু হঠাৎ নেকড়ে বাঘ ও বিড়ালের সংগে দেখা হলে ওরা আমাকে এক খাবারের দোকানে নিয়ে গেলো। সেখানে বসে এক একজনে হাতির মতো খেলো ওরা। তারপর রাতে একা একা হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথে ডাকাতের হাতে পড়ে গেলাম। তারা আমাকে ধরে একটা আমগাছের ডালে বেঁধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলো।

—তারপর?

—তারপর কোনো এক নীলকেশী সুন্দরী মেয়ে টের পেয়ে একটা গাড়ী পাঠিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এলো আমাকে। ডাক্তার দেখালো। ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললো—যদি আমি না মরে থাকি তবে বেঁচে আছি। সেই সময় একটা মিথ্যা কথা বলতেই আমার নাক লম্বা হতে লাগলো। শেষকালে এতো লম্বা হোল যে ঘরের বাইরে বেরুতে পারলাম না। তারপর আবার নেকড়ে ও বিড়ালের সংগে দেখা। তারা আমাকে নিয়ে গেলো সেই বাদবাকী চারটে সোনার মোহর (কারণ, একটা সেই খাবারের দোকানে খরচ হয়ে গিয়েছিলো) নিয়ে মাটিতে লাগাবার জন্যে। তাই দেখে টিয়া পাখী পর্যন্ত নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে আমাকে। শেষ পর্যন্ত দু'হাজার টাকা পাওয়া তো দূরে থাকুক আসলগুলোই হারালাম। বিচারকের কাছে বিচার চাইলাম। চোরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তিনি উল্টো আমাকেই কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

—আজব কাণ্ড দেখছি!

—হ্যাঁ বাবা আজবই বটে। এমন কি শুনেছে কেউ? যাহোক, কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে খিদের জ্বালায় আঙ্গুর ফল খেতে গিয়ে সেখানে মরা কলে আট্‌কা পড়লাম। ক্ষেতের মালিক চাষা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেলো তার বাড়ীতে। কুকুরের শিকল পরিয়ে দিলো গলায়। আমি তার কুকুরের মতো মুরগীর ঘর পাহারা দিতে লাগলাম। সেখান থেকে

বেরিয়ে এসে পথিমধ্যে একটা সাপ দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। অদ্ভুত ধরনের সেই সাপ! তার লেজ থেকে ধুঁয়া বেরুচ্ছিলো। বেচারা হাসতে গিয়ে মরে গেলো হঠাৎ। তারপর সেই সুন্দরী মেয়ের ঘরে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনি, সে মরে গেছে। তার জন্যে খুব কান্না এলো আমার। আমার সেই কান্না দেখে একটা কবুতর এসে বললো —

—আমি তোমার বাবাকে দেখেছি। সে বেচারা একটা ছোট নৌকা তৈরী করছিলো তোমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে। আমি তাকে বললাম—

—হায়, আমার যদি তোমার মতো ডানা থাকতো!

সে আমাকে বললো—

—তুমি তোমার বাবার কাছে যেতে চাও?

আমি বললাম—

—নিশ্চয়ই। কিন্তু কে আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে?

সে আমাকে বললো—

—আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

আমি বললাম—

—কেমন করে?

সে বললো—

—আমার পিঠে ওঠো।

আমি তার কথা মতো গিয়ে পিঠে উঠলাম। সে আমাকে নিয়ে সারাদিন সারারাত ধরে উড়ে উড়ে শেষ পর্যন্ত সেখানে নিয়ে পৌঁছালো। জেলেরা যারা সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলো আমাকে জানালো—

—নৌকার মধ্যে একটা হতভাগ্য বুড়োকে দেখা যাচ্ছে। বেচারা ডুবে যাচ্ছে।

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকালাম সেদিকে। দূর থেকে আপনাকে চিনতেও পারলাম। কারণ আমার প্রাণটাই কেঁদে কেঁদে বলছিলো আপনার কথা। হাতের ইশারায় অনেক ডাকাডাকিও করলাম। কিন্তু ফিরে এলেন না।

—আমিও তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম। বাটুল মিয়া বললো। তীরে ফিরে আসবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু বড় বড় ঢেউগুলোর জন্যেই

পেরে উঠলাম না। একটা বিরাট ঢেউ এসে আমাকে ডুবিয়ে দিলো। এই ভয়ানক মাছটা কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে গিলে ফেললো।

ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করলো—

- আপনি এখানে কতোকাল ধরে আছেন?

- সেদিন থেকেই। এখন প্রায় দু'বছর হতে চললো। কি বলবো বাবা ভণ্ডুল। এই দুটো বছর আমার কাছে আজ দু'-শতাব্দী বলে মনে হচ্ছে।

— তাহলে বেঁচে আছেন কেমন করে! আর এই মোমবাতিই বা পেলেন কোথায়! মোমবাতি জ্বালাবার জন্যে দিয়াশলাই বা জুটলো কোত্থেকে!

- বলছি। এখন সব বলবো তোমাকে। তুমি মনে করো না সেই ঝড় শুধু আমার নৌকাটাই ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো। বড় বড় অনেক জাহাজকেই ডুবতে হয়েছে। জাহাজের মানুষগুলো বেঁচে গিয়েছিলো অবশ্য। কিন্তু জাহাজ রেহাই পায় নি।

ভণ্ডুল আশ্চর্য হয়ে বললো—

সে আবার কি! জাহাজটাই খেয়ে ফেলেছে নাকি?

- হ্যাঁ, গোটাটাই ধরে গিলে ফেললো। আমার ভাগ্যটাও তো খুলে গেলো সেই জন্যেই। এই বিরাট জাহাজটার ভিতরে অনেক মাংস ছিলো, বিস্কুট ছিলো, ভাত ছিলো, পানি ছিলো, চিনি ছিলো, দিয়াশলাই ছিলো, মোমবাতি ছিলো, আরো কতো কি! এসব ছিলো বলেই তো আমি দু-দুটো বছর কাটিয়ে দিতে পেরেছি। কিন্তু এখন প্রায় সব শেষ। এই যে মোমবাতিটা দেখছো এটাই হোল শেষ মোমবাতি। এ ছাড়া আর কোনো বাতি নেই।

— তারপর?

—তারপর আবার কি! দুজনকেই এই অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে।

ভণ্ডুল বললো —

--তাহলে বাবা, সময় নষ্ট করে কাজ নেই। কেমন করে পালানো যায় সে চিন্তাই করা দরকার।

—পালাবে! কিন্তু কেমন করে?

—মাছের মুখের ভিতর দিয়ে সমুদ্রে নেমে সাঁতার কেটে।

—ভালো কথাই বলেছো তুমি। কিন্তু বাবা ভণ্ডুল আমি যে সাতার জানিনা!

—তাতে কিছু এসে যাবে না। আপনি আমার পিঠে বসবেন। আমি ভালো সাঁতার জানি। কথা দিচ্ছি—ভালোভাবেই নিয়ে যেতে পারবো আপানাকে।

—বৃথা, সব বৃথা। বাচ্চা আমার, সব বৃথা। বাটুল মিয়া বললো মাথা নেড়ে আর মুখ ম্লান করে। আমি বুঝতে পারছি না কেমন করে তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে। তোমার শক্তিই বা কতোটুকু!

—চেষ্টা করেই দেখি না। কপালে যা আছে তা-ই হবে। এখানে থাকলেও তো মরতে হবে। তারচেয়ে সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মরাই ভালো। তবুও মনকে প্রবোধ দিতে পারবো, দুজনেই একসাথে মরতে পেরেছি।



আর কিছু না বলে পুতুল মোমবাতি হাতে নিয়ে রওনা করতে উদ্যত হোল আর বাবাকে বললো—

—আপনি আমার পিছু পিছু আসুন। কোনো ভয় করবেন না।

এমনি করে অনেক হাঁটলো ওরা মাছের পাকস্থলী ও দেহের অন্যান্য অংশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু রাক্ষসের প্রকাণ্ড গলার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়ালো। সেখান থেকেই গলাটার শুরু। সুযোগ বুঝেই পালাতে হবে সেখান থেকে। একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে থাকবে না।

তোমাদের জানা দরকার মাছটা ছিলো খুবই বুড়ো। হাঁপানিতে ভুগছিলো সে। বুকে ধক্-ধক্ শব্দ করতো বলে খোলা মুখে ঘুমাবার প্রয়োজন ছিলো এবং ঘুমাচ্ছিলোও। তাই ওদের চোখে বাইরের জ্যোৎস্নার আলো আর আকাশের তারাগুলি ঝলমলিয়ে উঠলো। ভিতরটাও নজরে আসছিলো বেশ। ভণ্ডুল তার বাবার কাছে গিয়ে কানে কানে বললো—

—এটাই পালাবার উপযুক্ত সময়। মাছটা এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। সমুদ্রও শান্ত। দিনের আলোর মতো জ্যোৎস্না ঝরছে। কাজেই আর দেরী নয় বাবা। আপনি আসুন আমার সংগে। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তি পেয়ে যাবো আমরা।

তারপর ধীরে ধীরে ওরা গলার মধ্যে চলে এলো। কি বিরাট হা বাবা! ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি পা ফেলে জিভের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলো ওরা। অনেক লম্বা-চওড়া জিভটাকে মনে হচ্ছিলো রাজপথের মতো।

বিপদ কি আর একটা! আরেক বিপদের সম্মুখীন হোল ওরা। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাবে ঠিক সেই সময় হঠাৎ হেঁচে উঠলে মাছটা। সেকি হাঁচি। ধাক্কা সামলাতে না পেরে ওরা আবার গিয়ে পড়লো মাছের পেটের মধ্যে। বাস্, শেষ। মোমবাতি গেলো নিভে। বাবা ও ছেলে দুজনেই অন্ধকারে পড়ে রইলো।

—এখন কি করবো? ভণ্ডুল মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করলো বাটুল মিয়াকে।

—কি আর করবে বাবা। এখানেই সব শেষ।

—কেনো শেষ হতে যাবে বাবা! আমার হাত ধরুন—ধরুন তো আমার হাত। সাবধান, দেখবেন আছাড় না খেয়ে পড়েন।

—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

—আবার পালাতে হবে। আসুন আমার সংগে। ভয় করলে চলবে না এখন—বলেই ভণ্ডুল তার বাবার হাত ধরলো। আর আগের মতই চুপিসারে হাঁটতে হাঁটতে আবার রাক্ষসের গলায় গিয়ে ঢুকলো। পরে সমস্ত জিভটা পার হয়ে একে একে দাঁতের তিনটি ঘেরাই অতিক্রম করলো। সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে পুতুল তার বাবাকে বললো—

—আমার পিঠে উঠে বসুন। শক্ত করে ধরুন। আর যা করতে হয় আমিই করছি।

বাটুল মিয়া তার ছেলের পিঠে উঠে বসলো শক্ত করে ধরে। ভণ্ডুল আর অপেক্ষা না করে সোজাসুজি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিলো।

সমুদ্র ছিলো তেল বরাবর শান্ত। চাঁদ অঝরে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছিলো। মাছ তো ঘুমেই বিভোর। কুম্ভকর্ণের মতো পড়ে ঘুমুচ্ছিলো সে। কামান গোলার ভীষণ শব্দও বুঝি তার ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

॥ ছত্রিশ ॥

অবশেষে ভণ্ডুল রক্ত মাংসের তৈরী একটা মানুষের ছেলে হয়ে যায়।

ভণ্ডুল সাঁতার কাটছে তখনো। তাড়াতাড়ি তীরে পৌঁছুবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বাটুল মিয়ার পা ছিলো পানির মধ্যে ডুবে। ভণ্ডুল টের পেলো তার বাবা থরথর করে কাঁপছে জ্বরের মতো। ভয়ে না শীতে কে জানে! সম্ভবত দুই কারণেই হতে পারে।

ভণ্ডুলের অনুমান, হয়তো ভয়ের চোটেই কাঁপছে। তাই সে বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—

—ভয় কিসের বাবা! কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমরা তীরে গিয়ে উঠছি।

—কোথায় সেই তীর? বুড়ো জিজ্ঞেস করলো আরো উদ্বিগ্ন হয়ে। আর তার চোখ দুটো তীরের দিকে নিরীখ করে রইলো, যেমন করে দর্জিরা সুঁই এ সুতো পরাবার চেষ্টা করে। তারপর আবার বললো—আমি চারিদিকেই তাকাচ্ছি। কিন্তু কই, আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া তো কিছুই নজরে ভাসছে না!

বাবার কথা শুনে বেচারা ভণ্ডুল হাসতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসবে কেমন করে? শরীরের শক্তি যে কমে গেছে অনেক। নিশ্বাস বড় হতে চলেছে আগের চেয়ে। এগুতে যেন আর পারছে না। তীর

নাজানি এখনো কতো দূর। তবুও হাল ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না! যতোক্ষণ পারা যায় এইভাবে সাঁতার কাটতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো—

—বাবা আর তো পারছি না। আমাকে সাহায্য করো। নইলে ডুবেই মরে যাবো।

বাবা আর ছেলে প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম হোল। তখন একটা ভাঙা কলসীর মতো কার গলার শব্দ শোনা গেলো।

—.ক—কে মরে যাচ্ছে?

—আমি আর আমার হতভাগ্য বাবা।

—গলাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে। তুমি ভণ্ডুল না?

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো। কিন্তু তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

—আমি রুই মাছ। মাছের পেটের কারাগারের বন্ধু তোমার।

—তুমি কেমন করে পালিয়ে এসেছো!

—তোমাদেরকে অনুসরণ করে। তোমরাই তো আমাকে পথ দেখালে। তোমাদের পিছনে পিছনে আমিও পালিয়ে এলাম।

—বেশ ভালোই করেছো। রুইমাছ তুমি ঠিক সময়ই এসে পড়েছো। আমাদেরকে একটু সাহায্য করো। নতুবা এখানেই ডুবে মরতে হবে আমাদের।

—নিশ্চয়ই করবো। আমার প্রাণ দিয়েও সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আমার লেজ ধরো। চার মিনিটের মধ্যেই তোমাদেরকে তীরে পেঁৗছিয়ে দিচ্ছি।

তোমরা বুঝতেই পারছো, বাটুল মিয়া আর ভণ্ডুল তক্ষুণি মাছের কথা মতো কাজ করলো। কিন্তু লেজ না ধরে ওরা পিঠের উপরে চড়ে বসলো। ভণ্ডুল মাছকে জিজ্ঞেস করলো—

—আমাদের ওজন কি খুব বেশী?

—ওজন? একটুও না। আমার মনে হচ্ছে, পিঠের উপরে দুটো ঝিনুক রয়েছে। রুই মাছ উত্তর দিলো।

তীরে পৌঁছামাত্রই নেমে পড়লো ভণ্ডুল। বাবাকে টেনে তুললো। আর রুই মাছকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বললো—

—বন্ধু আমার, তুমি আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দিলে। তোমাকে কি

দিয়ে যে ধন্যবাদ জানাই! কমপক্ষে তোমার মুখে একটা চুমু খেতে দাও আমাকে। চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।

তখন রুইমাছ পানি থেকে মুখ বের করে দিলো। ভণ্ডুল মাটিতে হাটু গেড়ে ইচ্ছে মতো চুমু খেলো।

ভণ্ডুলকে অমনভাবে চুমু খেতে দেখে রুই মাছের প্রাণটা গলে গেলো। ভণ্ডুলের উপরে মায়ায় অশ্রুসজল হয়ে উঠলো সে। চোখের পানি ওরা না দেখবার আগেই পানিতে ডুব দিলো সে। আর ফিরে এলো না।

ইতিমধ্যে বেলা হয়ে গেছে বেশ। ভণ্ডুল তার বাবার হাত ধরে বললো -

—চলুন যাই বাবা। আমার হাতের উপরে ভর করে ধীরে ধীরে পিঁপড়ের মতো করে চলুন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে পথে কোথাও বিশ্রাম করে নেবো।

—কোথায় যেতে হবে? বাটুল মিয়া জিজ্ঞেস করলো।

—একটা ঘর খুঁজে বের করতে হবে অথবা কোনো দয়ালু লোক। যেখানে গেলে আমরা একটু আশ্রয় পাবো।

প্রায় একশ' হাত চলে গেলো ওরা। সেখানে রাস্তার পাশে দুটো পশুকে দেখতে পেলো। বড্ড কুশ্রী চেহারা। তারা ওদের কাছে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইলো। ওরা কারা জানো? সেই বিড়াল আর নেকড়ে বাঘ। কিন্তু তাদের দেখে চেনবার কায়দা নেই। বিড়াল অন্ধের ভান করতে করতে ঠিক অন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। আর নেকড়ে বাঘ তখন খুবই বুড়ো। তার লেজটাও ছিলো না। দুষ্টু চোর অভাবে পড়ে লেজটা বিক্রি করে দিয়েছে। যার কাছে বিক্রি করা হয়েছিলো সে মাছি তাড়াবার জন্যে কিনে নিয়েছিলো সেটা।

—ভণ্ডুল, আমাদের ভয়ানক অসুখ ভাই। কিছু ভিক্ষা দাও দয়া করে। বিলাপের সুরে চিৎকার করে উঠলো নেকড়েটা।

—কিছু ভিক্ষা দাও দয়া করে। আবার বিড়াল বললো।

—সালাম মুখোশ। পুতুল উত্তর দিলো। একবার আমাকে ঠকিয়েছিলে। আর কোনোদিন ধরা পাবে না।

—বিশ্বাস করো ভণ্ডুল। আজ আমরা বড় গরীব। বড্ড দুর্ভাগা আমরা।

—গরীব আর দুর্ভাগা আমরা। বিড়াল আবার বললো।

—যদি তোমরা সত্যি সত্যিই গরীব হয়ে থাকো সেতো তোমাদেরই কর্মের ফল। সেই প্রবাদবাক্যের কথা স্মরণ করো—"চুরির টাকায় কোনো ফল দেয়না।" সালাম মুখোশ। আমার প্রতি দয়া করো।

—আমাদের প্রতিও দয়া করো। নেকড়ে বললো।

—দয়া করো। বিড়াল সায় দিলো।

—সালাম মুখোশ। সেই প্রবাদবাক্যকে স্মরণ করো—"শয়তানের ময়দা শেষ পর্যন্ত কুড়োয় পরিণত হয়।"

—আমাদের ত্যাগ করে যেও না ভাই!

—[illegible] করো। বিড়াল আবার বললো।

—সালাম মুখোশ। সেই প্রবাদ বাক্যকে স্মরণ করো—"যে প্রতিবেশীর কোট চুরি করে সে জামা অভাবে মরে যায়।"

ওদের সাথে আর কোনো কথাবার্তা না বলে ভণ্ডুল বাটুল মিয়াকে নিয়ে একটা পথ ধরে এগিয়ে চললো। আবার একশ' হাত গিয়েই গলির মাথাটায় চমৎকার একটা বিচালীর ঘর দেখতে পেলো।

—ওই ঘরটায় কেউ থাকবে নিশ্চয়। ভণ্ডুল বললো। চলুন যাই বাবা দরজায় কড়া নেড়ে দেখি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো।

—কে? ভিতর থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।



—আমরা। দুজন হতভাগ্য বাবা ও ছেলে। অন্নহীন ও ঘরদোরহীন। পুতুল জবাব দিলো।

—চাবিটা ঘুরিয়ে দাও, দরজা খুলে যাবে। একই কণ্ঠ শোনা গেলো আবার। ভগুল চাবি ঘুরাতেই দরজা খুলে গেলো। ওরা ঘরে ঢুকেই এদিক সেদিক তাকালো। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলো না কোথাও।

—একটু আগে কে কথা বললো? ভগুল জিজ্ঞেস করলো আশ্চর্য হয়ে।

—এই যে এখানে। উপরে তাকিয়ে দেখো।

তখন বাবা ও ছেলে দুজনেই ছাদের দিকে তাকালো। আর একটা আড়ার উপরে ঝিঁ-ঝি পোকাকে দেখতে পেলো।

—আরে আমার ঝিঁ-ঝি পোকা যে! ভগুল সালাম জানিয়ে শান্ত গলায় বললো।

—এখন দেখছি ঝিঁ-ঝি পোকাকে "আমার" বলে ডাকছো। বলি ব্যাপার কি? কিন্তু যে দিন আমাকে হাতুড়ির ঘা মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে সে দিনের কথাটা ভেবে দেখোতো একবার!

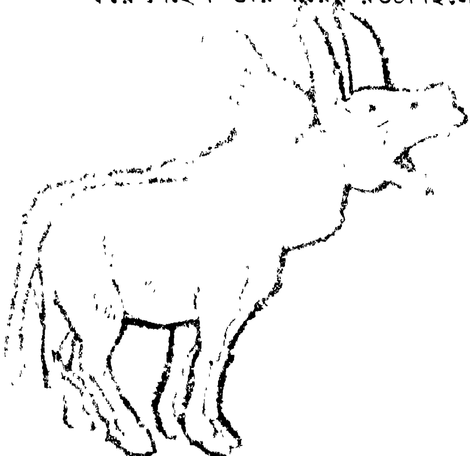
—ঠিকই বলেছো ঝিঁ-ঝি পোকা। এখন মনে পড়েছে সব। বেশতো তার বিনিময়ে তুমিই আমাকে তাড়িয়ে দাও এখন। আমাকে হাতুড়ি ছুঁড়ে মারো। কিন্তু আমার বেচারা বাবার প্রতি দয়া করো।

—বাবা এবং ছেলে দুজনের প্রতিই দয়া করবো। আমি শুধু তোমার দুষ্টুমির কথা স্মরণ করিয়ে তোমাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। মনে রেখো, এ সংসারে ছোট বড় সবার সাথেই ভদ্রভাবে ব্যবহার করতে হবে। যদি উপযুক্ত সময়ে আবার সেই ভদ্রতার প্রতিদান পেতে চাও।



—ঠিক ঠিক ঝিঁ-ঝি পোকা। তোমার কথা সব সময় মনে থাকবে। আচ্ছা এমন সুন্দর ঘরখানা কেমন করে কিনতে পেরেছো !

—কিনিনি। এই ঘরটা একটা সুন্দর ছাগল গতকাল আমাকে দান করে গেছে। তার গায়ের রঙটা ছিলো সাদা। চমৎকার লাগছিলো তাকে



—সেই ছাগলটা কোথায় এখন ? ভণ্ডুল আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

— তা জানি না।

আবার কখন আসবে বলে গেছে কিছু ?

কোনদিন আর আসবে না। গতকাল খুব দুঃখ করে চলে গেছে বেচারী।

কেনো কেনো—দুঃখ করলো কেনো ?

—ভণ্ডুলের জন্যে। বলছিলো ভণ্ডুলকে বুঝি আর দেখতে পাবো না। রাক্ষস মাছটা তাকে একেবারেই গিলে খেয়েছে।

—সত্যি বলছো ? তাহলে সে আমার পরী-মা ছাড়া আর কেউ নয়। চিৎকার করে কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে উঠলো। এমনি করে অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর একটু হালকা হলে চোখ দুটো মুছে কি যেন ভাবলো কতক্ষণ। তারপর কিছু বিচালী পেতে বাবাকে শুতে জায়গা করে দিলো। বুড়ো বাটুল মিয়া শুয়ে পড়লো তক্ষুণি। তারপর ভণ্ডুল আবার ঝিঁ-ঝি পোকাকে জিজ্ঞেস করলো

— ভাই ঝিঁ-ঝি পোকা ! বলতে পারো কোথা থেকে বাবার জন্যে একগ্লাস দুধের ব্যবস্থা করা যায় ?

—এক কাজ করো। কাছেই একটা চাষার বাড়ী আছে। তার গরু রয়েছে। সেখানে গেলেই দুধ পেতে পারো।

ভণ্ডুল তখন তাড়াতাড়ি সেই চাষার কাছে গেলো। চাষা তাকে জিজ্ঞেস করলো—

কতোটুকু দুধ চাও ?

—এক গ্লাস হলেই চলবে।

—দিতে পারি। চার আনা পয়সা লাগবে।

—আমার কাছে যে একটা পয়সাও নেই। ভণ্ডুল দুঃখের সাথে জানালো।

—এসব কোনো কাজের কথা নয় পুতুল। তোমার কাছে যদি একটা পয়সাই না থাকে, তবে আমার কাছে এক ফোঁটা দুধও নেই।

—ঠিক আছে, তবে থাক—ভণ্ডুল বললো। আর চলে যেতে উদ্যত হোল।

—দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো—চাষা বললো। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি হতে পারে। তুমি বাঁশ ঘুরিয়ে কূয়ো থেকে পানি তুলতে পারবে?

—কূয়ো কি?

—পানির গর্ত। বাঁশের কল ঘুরিয়ে তা থেকে পানি তুলে তরকারির বাগানে ছড়াতে হয়।

—চেষ্টা করবো। পুতুল বললো।

—তাহলে তুমি একশ বালতি পানি তুলে দাও। আমি তোমাকে এক গ্লাস দুধ দেবোই।

আচ্ছা।

চাষা তার সেই বাগানে পুতুলকে নিয়ে গেলো। আর কেমন করে বাঁশের কল ঘুরাতে হবে সে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিলো। ভণ্ডুলও সংগে সংগে কাজ শুরু করে দিলো। কিন্তু একশ' বালতি পানি তোলার আগেই তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে একাকার হয়ে গেলো। এমন কষ্ট সে কোনোদিনই করেনি।

—এ পর্যন্ত এই বাঁশ ঘুরাবার কাজটা আমার গাধাই করে দিয়েছে। কিন্তু আজ সেই বেচারা পশুটি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌছেছে।

—আপনি আমাকে একটু নিয়ে যাবেন তার কাছে? ভণ্ডুল বললো।

—নিশ্চয়ই। খুব খুশী হয়ে নিয়ে যাবো।

ভণ্ডুল সেই গাধার ঘরে ঢুকে বিচালীর উপরে শোয়া একটা সুন্দর গাধাকে দেখতে পেলো। অতিরিক্ত ক্লান্তি আর খিদের জ্বালায় শেষ অবস্থায় এসে পৌছেছে সে। পুতুল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। মনে মনে বললো—

—মনে হয় গাধাটা আমার পরিচিত। এর চেহারা আমার কাছে নতুন



—বাবা বাজারে যাচ্ছি। আমার জন্যে একটা কোট, একটা টুপি, আর একজোড়া জুতো কিনবো। আবার হেসে বললো—

—যখন বাড়ীতে ফিরে আসবো একটা বড় সাহেবের মতো দেখাবে আমাকে।

বাড়ী থেকে বের হয়ে খুশীতে লাফালাফি করে চলতে লাগলো পুতুল। হঠাৎ শোনা গেলো কেউ তাকে ডাকছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে একটা সুন্দর শামুককে ঝোপ থেকে বের হয়ে আসতে দেখলো।

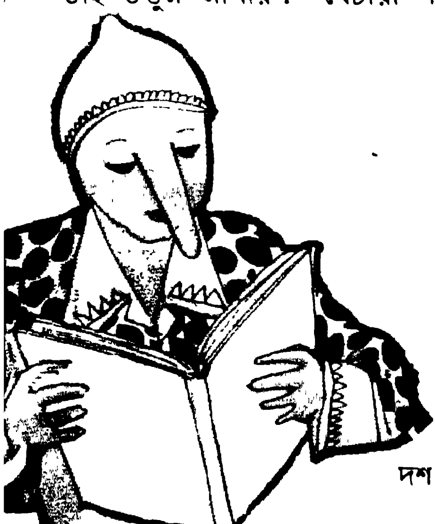
—আমাকে চিনতে পারলে না? শামুক প্রশ্ন করলো।

—মনে হয় ·· ··· ··

—নীলকেশী পরীর দাসী সেই শামুকের কথা তোমার মনে পড়ে? মনে নেই সেদিন আমি আলো নিয়ে এসেছিলাম? তোমার পা দরজার ভিতরে আটকে ছিলো - মনে নেই সে সব? ভণ্ডুল একরকম চেঁচিয়েই উঠলো--

—হ্যাঁ, সব মনে পড়েছে। তা ভাই শামুক, এক্ষুণি বলো, কোথায় আমার সেই সুন্দরী পরী-মা? এখন কি করেছেন তিনি? আমাকে কি ক্ষমা করেছেন? আমার কথা কখনো বলেন? আমাকে কি আগের মতো এখনো ভালোবাসেন? এখান থেকে কতো দূরে থাকেন? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাবো? এ ভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চললো পুতুল। আর শামুক ধীরে ধীরে জবাব দিলো।

—ভাই ভণ্ডুল আমার! বেচারা পরী হাসপাতালে শয্যাগত।



—হাসপাতালে?

—হ্যাঁ। দুঃখে দুঃখে শেষ পর্যন্ত ভীষণ অসুখ হোল তার। তাছাড়া, বেচারী অভাবে পড়ে ভাত পর্যন্ত কিনে খেতে পারছে না এখন।

—তাই নাকি! হায় কি দুঃসংবাদই না দিলে আমাকে। আহা বেচারী পরী! বেচারী পরী! বেচারী পরী! আমার কাছে যদি এক্ষুনি গিয়ে তোমাকে দিয়ে দশ হাজার টাকাও থাকতো এখন!

আসতাম। কিন্তু হায়, মাত্র চল্লিশটা টাকা রয়েছে আমার কাছে এ দিয়ে আমার জন্যে নতুন কাপড় চোপড় কিনতে যাচ্ছিলাম। নাও ভাই শামুক—আমার পরী-মাকে দিয়ে দিও টাকাগুলো।

—আর তোমার জামা-কাপড় ?

—ঠিক আছে। জামা-কাপড়ের জন্যে কিছু এসে যাবে না। আমার গায়ের পুরানো কাপড় চোপড়ও বিক্রি করে দিতে রাজী আছি তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে। যাও, তাড়াতাড়ি করে যাও। দুদিন পরে আবার ফিরে এসো। আশাকরি তখন তোমাকে আরো কিছু দিতে পারবো। এ পর্যন্ত বাবাকে খেতে দেবার জন্যে কাজ করেছি। আজ থেকে না হয় আরো পাঁচ ঘণ্টা করে প্রত্যেকদিন বেশী কাজ করবো। আমার সুন্দরী পরী-মাকে অন্তত দুটো খেতে দিতে পারবো নিঃসন্দেহে। ধন্যবাদ শামুক। আবার দুদিন পরে ফিরে এসো অবশ্যই।

শামুক তখন আর শামুক নেই। একটা টিকটিকির মত দ্রুত চলতে শুরু করে দিলো।

ভণ্ডুল বাড়ী ফিরে গেলে বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলো—

—কি কি কাপড় চোপড় আনলে দেখি!

—কিছু আনিনি বাবা। পছন্দসই কোনো কছুই পেলাম না। আরেক দিন গিয়ে কিনে আনবো।

সেই রাতে ভণ্ডুল দশটা পর্যন্ত কাজ না করে বারোটা পর্যন্ত করলো। আটটা ঝুড়ির পরিবর্তে ষোলটা ঝুড়ি তৈরী করে ফেললো। তারপর গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরীকে স্বপ্ন দেখলো। পরী হাসছে আর তাকে চুমু খেয়ে বলছে—

—ভণ্ডুল, বেশ ভালো। তোমার প্রাণে এতো দয়া! তাইতো আমি পুরোপুরি ক্ষমা করেছি তোমাকে। ছেলেরা যারা ভক্তির সাথে গরীব আর অসুস্থ পিতামাতাকে সাহায্য করে তারা যদি এক আধটুকু অবাধ্যও হয়, আচার ব্যবহার পুরোপুরি ভালো না হয়, কিছু এসে যায় না তাতে। তারা সব সময় প্রশংসা ও স্নেহ পাবার যোগ্য। ভালো থাকবে আর ভবিষ্যতে সুখী হতে পারবে তারা।

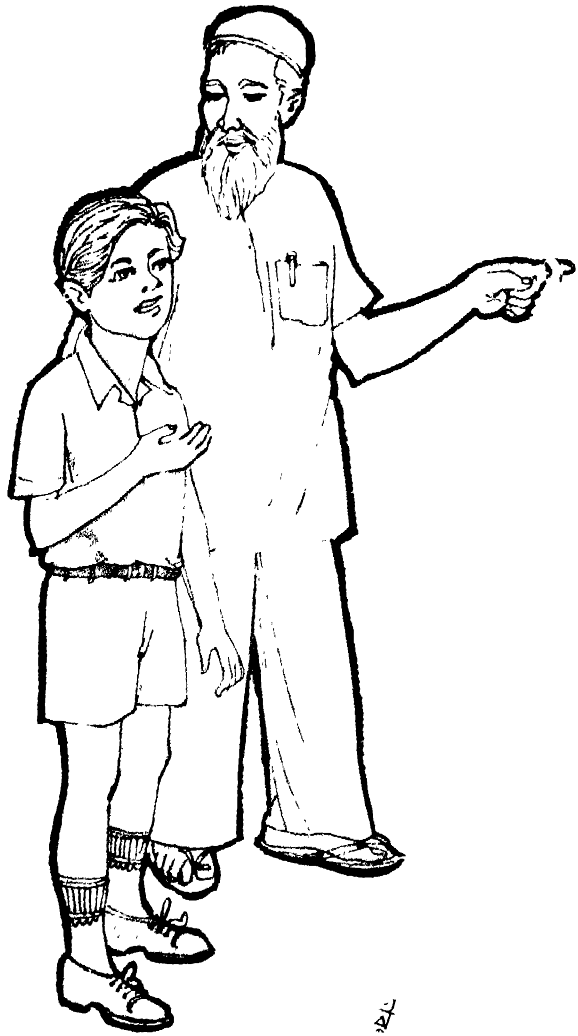
হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে গেলো। ভণ্ডুল উঠে বসলো। তোমরা ভেবে দেখো কি আশ্চর্য ব্যাপার সব। ভণ্ডুল কতোখানি আশ্চর্য হোলো যখন দেখলো

সে আর আগের মতো কাঠের পুতুল নেই। আর সব ছেলেদের মতোই মানুষ হয়ে গেছে। ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করলো। দেখা গেলো বিচালীর পরিবর্তে দেয়ালগুলো সুন্দর করে সাজানো। আর সেই ঘরে ভগুল নিজে বসে। ভুল দেখছে না তো? চোখ দুটোকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে।



তারপর খাট থেকে নেমেই একটা নতুন কাপড়, নতুন টুপি, আর নতুন জুতো পেলো। সেগুলো পরে স্বাভাবিকভাবে যেই পকেটে হাত চালিয়ে দিলো—ওমা, তার মধ্যেও একটা মানিব্যাগ। মানিব্যাগটার উপরে লেখা

রয়েছে—"স্নেহের ভণ্ডুলকে ধন্যবাদের সংগে নীলকেশী পরী তার দেওয়া সেই চল্লিশটা টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে।"



মানিব্যাগ খুলতেই উল্লিখিত চল্লিশ টাকার পরিবর্তে চল্লিশটা সোনার মোহর পেলো। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে ভণ্ডুল নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারছিলো না। আয়নায় আর সেই কাঠের পুতুলকে দেখা যাচ্ছে না। এখন তার কালো চুল, নীল চোখ। একটা সুখী আর ফর্সা রঙের জীবন্ত বুদ্ধিমান সুন্দর ছেলে সে।

কিছুই বুঝতে পারলো না ভণ্ডুল। কি সব আশ্চর্য ব্যাপার! তাহলে এখনো সে স্বপ্ন দেখছে নাতো? কি করে সম্ভব এসব!

সহসা চিৎকার করে বলে উঠলো—

—আমার বাবা কোথায়?

বলেই পাশের কাঁচ ঘেরা ঘরটার ঢুকে বাবাকে দেখতে পেলো।



নয়। আগেও যেন কোথায় দেখেছি আমি। তারপর তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে গাধার ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করলো—

—তুমি কে?

এই প্রশ্নে মৃতপ্রায় গাধাটা চোখ মেলে দিলো। আর তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে একই ভাষায় জবাব দিলো—

—আমি টে-টে-টেমি। বলেই চোখ বন্ধ করে শেষ নিশ্বাস টেনে নিলো।

—আহা বেচারা টেমি। অস্ফুট স্বরে ভণ্ডুল বললো। আর এক মুঠো বিচালী নিয়ে নিজের চোখের পানি মুছলো।

—সাধারণ একটা গাধার জন্যে তোমার অতো মায়া কেনো? চাষা

বললো। আমি টাকা পয়সা দিয়ে ওকে কিনে এসেছিলাম। তাহলে ভেবে দেখোতো আমার কতোখানি দুঃখ হওয়া উচিত।

—আপনাকে বলছি শুনুন। ও আমার একজন বন্ধু।

—তোমার বন্ধু ?

হ্যাঁ। আমার একজন ইসকুল-বন্ধু।

—কেমন করে? উচ্চ হাসি হেসে চাষা বললো। কেমন করে? তোমার ইসকুল-বন্ধুদের মধ্যে গাধাও ছিলো নাকি! বেশতো চমৎকার! তাহলে তোমার পড়াশুনাটা ভালোই হয়েছে, কি বলো ?

কথাটা শুনে ভণ্ডুলের কিন্তু লজ্জা লাগলো খুব। কোনো কথাই আর বললো না সে। দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সোজা বাড়ী ফিরে গেলো। সেদিন থেকে পাঁচ মাস ধরে রোজ সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে পুতুল সেই বাঁশের কল ঘুরাতে যেতো। আর এক গ্লাস করে দুধ রোজগার করে তার বাবাকে এনে দিতো। শুধু একাজই করতো না। অবসর সময়ে বাঁশের ঝুড়ি আর বেতের ধামা ইত্যাদি তৈরী করতে শিখতো। বিক্রি করে যা পয়সা পেতো তা দিয়ে কোনো রকমে প্রতিদিনের খরচটা চালিয়ে নিতো।

কাজের ফাঁকে ছোট একটা গাড়ীও তৈরী করে ফেললো ভণ্ডুল। তার বাবাকে আনন্দ দেবার জন্যেই তেরী করেছিলো। দিনে বিকেলের দিকে তাকে সেই গাড়ীতে চড়িয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতো। রাতে নিজের লেখাপড়া করতো।

কাছেই ছিলো একটা গ্রাম। সেখানে বইয়ের দোকান ছিলো। সেখান থেকে একটা মোটা বই কিনে আনা হোল। সেই বই পড়তো ভণ্ডুল। লিখবার জন্যে কঞ্চি দিয়ে একটা কলম বানিয়ে নেওয়া হোল। আর পুঁই শাকের ফল দিয়ে তৈরী হোল কালি।



সংসার আর পড়াশুনার খরচপত্তর চালিয়ে কিছু কিছু করে টাকা পয়সা জমাও করেছিলো ভণ্ডুল। তা দিয়ে শেষে একটা নতুন কাপড় কিনলো। একদিন সকালে তার বাবাকে বললো—

সুস্থ, সুখী এবং জেদী অবিকল আগের মতোই। আগের মতোই সে কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করছিলো। ফটোর জন্যে একটা সুন্দর দেখে ফ্রেম তৈরী করছিলো। টুক্‌টাক্‌ করে কেটে কেটে নানা রকম ফুল আর পশুদের মাথা খোদাই করছিলো ফ্রেমটায়। ভণ্ডুল বাবার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করলো—

—বাবা, মনে মনে একটা কৌতূহল জাগছে আমার। বারে বারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হঠাৎ করে এমন সব পরিবর্তন কেনো?

বাটুল মিয়া গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো—

—এসব তোমারই জন্যে।

—আমার জন্যে কেনো?

—দুষ্টু ছেলেরা যখন ভালো হয়ে যায় তাদের একটা পরিবর্তন আসেই। এমন কি তাদের পরিবারের সবাইও নতুন জীবন ফিরে পায়।

—তাহলে সেই আগেকার ভণ্ডুল এখন কোথায়?

—ওই দেখো! বাটুল মিয়া উত্তর দিলো। আর আংগুল দিয়ে একটা বিরাট পুতুলকে দেখিয়ে দিলো। একটা চেয়ারের উপরে মাথা ফিরিয়ে, হাত ঝুলিয়ে, একটা পায়ের উপর আরেকটা পা আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিলো অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

ভণ্ডুল অবাক হয়ে তাকিয়েই রইলো সেদিকে। কিছুক্ষণ পর ভারী খুশী হয়ে বললো—

— কি অদ্ভুতই না ছিলাম। আহ্‌, এখন কি সুন্দর একটা ছেলে আমি! এরচেয়ে আমার খুশীর আর কি থাকতে পারে। সত্যিই আমি কতো ভাগ্যবান! কতো সুখী!

